৩৪ বর্ষ ● ৪র্থ সংখ্যা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ডিরোজিও	রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত	৩
ভাতের থালায় লুকিয়ে বিষ	গৌতম মিস্ত্রি	৯
সনাতন বিশ্বাস-২	জয়দেব গুপ্ত	১৪
চাকমা জাতির কুসংস্কার	দেবপ্রিয় চাকমা	১৭
শীতকালে অস্ত্রোপচার	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২২
সেঁক নিয়ে সাতপাঁচ	ভুবন পাল	২৪
আশ্চর্য প্রতিভা পাঠানি	সমীরকুমার ঘোষ	২৫
গণিতের সঙ্গে চলাফেরা	ভূপতি চক্রবর্তী	২৯

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
কার্যালয়: খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০ ১৩৬
ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/
৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট: www.utsamanush.com
ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

শারদোৎসব ও কিছু প্রশ্ন

বাঙালির প্রিয় শারদোৎসব কাটল। সারা বছরের দুঃখ-কষ্ট ভুলে এতগুলো মানুষ আনন্দে মাতল, এ নিয়ে কারো কিছু বলার থাকতে পারে না। তবুও চারদিকের উৎসবের আতিশয্য দেখতে দেখতে কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে ঘুরপাক খায়। আমাদের রাজ্যে ৩৫ বছর বামপন্থী সরকার রাজত্ব করেছে। তারা মার্কসবাদে বিশ্বাস করত, মাও সে তুংয়ের কালচারাল রিভলিউশনের কথা বলত। মার্কস ধর্মকে আফিং বলেছিলেন। মার্কসীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসীরা মনে করেছিলেন বামপন্থীরা আফিংয়ের নেশা ছাড়ানোয় উঠেপড়ে লাগবেন। বিশাল কর্মীবাহিনী নেমে পড়বে লাগাতার প্রচার ও সচেতনতার আন্দোলনে। বারোয়ারি পুজোয় রাশ টানবে। লোকের মন থেকে ক্রমশ কেটে যাবে ধর্মীয় উন্মাদনা। যায় নি। উল্টে প্রাথমিক শূচিবায়ুগ্রস্ততা ঝেড়ে ক্রমশ বামপন্থী নেতা-কর্মীরা বারোয়ারি পুজোয়, কারও মতে মোচ্ছব, শরিক হয়েছেন। বিপ্লব সীমায়িত রেখেছেন রাস্তার মোড়ে চারটি সাবেক রাশিয়া-প্রকাশিত বইয়ের স্টল দেওয়ার মধ্যে দিয়েই। দু-চারজন আপত্তি করলে মাওয়ের জলের মধ্যে মাছ হয়ে থাকার এক তত্ত্ব আওড়েছেন। ফল যা হওয়ার তাই। পুজোর জাঁক বেড়েছে, সংখ্যা বেড়েছে। বাবার মাথায় জল ঢালায় ভক্তের সংখ্যা প্রতি বছর আগের বারের রেকর্ড খান খান করে দিচ্ছে। গত এক দশকে জগদ্ধাত্রীপুজো দুর্গাপুজোর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। সম্প্রতি এসে গিয়েছে গণেশবাবাজি। হাওয়া যে রকম তেত্রিশ কোটি দেবতারা এক এক করে এসে পড়ল বলে। এখন সরকারে তৃণমূল। মা-মাটি-মানুষের সরকার। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বামুনের মেয়ে। তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের দেবদ্বিজে অগাধ ভক্তি। সব নেতা-মন্ত্রীরই নিজস্ব পুজো আছে। আশকারা পেয়ে পেয়ে চার দিনের পুজো ১৪ দিনে ঠেকেছে। মাসভর হল বলে! মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তৃতীয়ার দিনেই পুজোর উদ্বোধন করছেন। এতে কারও গাত্রদাহ হওয়ার কথা নয়। চার দিনের আনন্দ ১৪ দিনে গড়ালে তো ভালই। ভাগ্যবান সরকারি কর্মীরা লম্বা ছুটি পেয়ে চার হাত-পা তুলে সরকারকে আশীর্বাদ করছেন। পুজোর সাত দিন আগে থেকেই বারোয়ারি মণ্ডপ এবং পুরো পাড়ায় আলো লাগানো সারা। জ্বালিয়ে সবাইকে জানান দেওয়া হচ্ছে পুজো এসে গিয়েছে। বিদ্যুতের বিপুল অপচয়? ওসব নিয়ে কে মাথা ঘামায়। পুজোর কদিন শহরে অন্তত সন্ধেবেলায় কেউ রাস্তা দিয়ে নিজের মতো হাঁটতে পারেন না। তাঁকে বাঁশের খাঁচায় ঢুকিয়ে মণ্ডপে এবং সেখান থেকে একেবারে

উল্টো দিকে কোনো রাস্তা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। এমনকি নিজের বাড়িতে ঢুকতে গেলেও ঘুরপথে যেতে হয়! নাগরিক অধিকার কদিন শিকেয় তোলা থাকে। হয় মণ্ডপে যান, নইলে বাড়িতে বসে থাকুন। যতদিন না এ নিয়ে কোনো জনস্বার্থ মামলা হচ্ছে। রাস্তা আটকে মণ্ডপ তৈরি থেকে গঙ্গাদূষণ নিয়ে কথা না তোলাই ভাল। মাঝে শব্দদূষণ নিয়ে কিছু শোরগোল হয়েছিল। এখন যে কে সেই। ভুলভাল উচ্চারণের চণ্ডীপাঠ তারস্বরে মাইকে বাজে। উত্তর কলকাতায় চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে শব্দ ১০০ ডেসিবেল ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর বিসর্জনে নবতম সংযোজন ডিজে ধমাকা। কানের পর্দাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, না ফেটে অক্ষত থাকার জন্য। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তারা অবশ্য কানে আঙুল দিয়ে থাকেন!

সভ্যতা, প্রগতি মানেই যে ঝাঁ-চকচকে রাস্তা, উড়াল পুল, গগনে খোঁচা মারা অট্টালিকা। এটা সবার জানা। সাজানোর জন্য বাগানে বা রাস্তায় দু-চারটে গাছপালা বড়জোর চলতে পারে। মাটির রাস্তা, খানাডোবা, গাছপালা– ওসব গেঁয়ো, চাষাভুষোদের জন্য। আধুনিক হতে চাইলে ওসব যতটা সম্ভব ঝেঁটিয়ে নির্মূল করা দরকার। হচ্ছেও। পরিণাম? জম্মু-কাশ্মীরের সাম্প্রতিক প্লাবন। জম্মু-কাশ্মীরে বনসৃজনের জন্য বরাদ্দ টাকা লাগানো হয়েছিল অন্য কাজে, জানাচ্ছে ক্যাগ রিপোর্ট। ১৯৯১ থেকে ২০১২ ওখানকার সরকার অরণ্য অঞ্চলকে বদলে ফেলেছে অনারণ্য এলাকায়। এর ৬৮০ হেক্টর জুড়ে ছিল বন্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্য শোপিয়ান। মুঘল রোড তৈরি হয়েছে জঙ্গল কেটেই। বনসৃজনের টাকা খরচ হয়েছে ঋণ শোধে, অগ্রিম দেওয়ায়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনে, প্রাইভেট হোটেলের দেনা মেটানোয় ইত্যাদি। এছাড়াও কেনা হয়েছে কার্পেট, এলইডি, এসি মেশিন, আইপড, সোফা সেট, প্রোজেক্টর, গাড়ি। তৈরি হয়েছে অফিস কেবিন, বসেছে ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি। শ্রীনগরের বিখ্যাত ডাল লেককে ১৫ শতাংশ ছোট করে ফেলা হয়েছে। কেউ বলতেই পারেন, সুসভ্য হতে চাইলে এটুকু তো সহ্য করতেই হবে। বিশিষ্ট স্থপতি গৌতম ভাটিয়া 'কেদারনাথ টু কাশ্মীর, দ্য ট্র্যাজেডি অভ ডেভলপমেন্ট'-এ সবিস্তার দেখিয়েছেন উন্নয়নের ঘনঘটার ফল।

দাবানল লাগলে দেবালয়ও তার প্রকোপ এড়ায় না, এ জাতীয় একটা প্রবাদ আছে। দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধির প্রশ্নে আমাদের কেন জানি না বিচারব্যবস্থা ও তদন্তকারী সংস্থা সি বি আই সম্পর্কে এক অন্ধ বিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু সর্ষের মধ্যেও ভূতেরা ঢুকে পড়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কাটজু, যিনি এখন প্রেস কাউন্সিল অভ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান, একটি বোমা ফাটিয়েছেন। জানিয়েছেন কীভাবে এক দাগী বিচারপতিকে তাঁর পদে স্থায়ী করা হয়েছে রাজনৈতিক চাপে। সেই সঙ্গে তিনি বিচারবিভাগের দুর্নীতি নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। বলেছেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকার সময় তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি লাহোটিকে পাঁচজন দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকের তালিকা দিয়েছিলেন। উনি ব্যাপারটা চেপে যেতে বলেন, বিচারব্যবস্থার সুনামহানির শঙ্কায় এবং অবশ্যই রাজনৈতিক কারণে। কাটজু নিশ্চয়ই হিমশৈলের চুড়োটা দেখতে পেয়েছিলেন! আর সি বি আই প্রধানের বাড়িতে অভিযুক্তদের হত্যে দেওয়ার খবর তো সবার জানা, যা নিয়ে মামলাও শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উৎসাহের অন্ত নেই। নানা চমকের মধ্যে তাঁর একটি চমক 'স্বচ্ছ ভারত' গড়ার আহ্বান। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বিশিষ্ট শিল্পপতি অনিল আম্বানিকে দেখা গেল মহার্ঘ জুতো পায়ে ঝাঁটা হাতে পথে নেমেছেন। রথের সময় ইসকন নামে এক গোষ্ঠীও কোনো বিশিষ্ট মানুষের হাতে সোনার ঝাড়ু ধরিয়ে দিয়ে রাস্তা সাফ করান। সে ছবি কাগজে ছাপাও হয়। দেশ যেমন অস্বচ্ছ তেমন অস্বচ্ছই রয়ে যায়। এবার দেখা যাক, মোদিজি কতটা আমাদের সযত্নলালিত অস্বচ্ছ থাকার অভ্যাস ছাড়াতে পারেন।

গত দু সংখ্যা আগে আমাদের পত্রিকায় পাঁচটি সাদা বিষের অন্যতম নুনকে নিয়ে লেখা হয়েছিল। লেখাটা পড়েও যাঁরা নুন খাওয়া কমানো নিয়ে দোনামোনা করছিলেন, তাঁদের জন্য জানাই, সম্প্রতি ১৮৭টি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অভ মেডিসিন জানিয়েছে, ২০১০ সালেই মানুষ এত বেশি পরিমাণে নুন খেয়েছে যে তার জেরে ১.৬৫ মিলিয়ন মানুষ মারা যাবে হৃৎপিণ্ডের সমস্যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিনে ২ গ্রাম নুন খাওয়ার অনুমোদন দেয়। মানুষ খাচ্ছে গড়ে ৩.৯ গ্রাম। প্রায় দ্বিগুণ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর ভারতে চালানো সমীক্ষা আরও ভয়ঙ্কর তথ্য দিচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে শহুরে লোকজন দিনে গড়ে ৭.৬ গ্রাম নুন খাচ্ছে। নুন তথা সোডিয়ামের সঙ্গে রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ এবং তা থেকে মৃত্যুর ঘটনা আর নতুন করে প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না।

এর মধ্যে একটা সুখবর। গুজরাট খাওয়ার জিনিসের জিন-বদল পরীক্ষা চালানোর অনুমতি দেয় নি। এর আগে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা রাজ্য জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (জি এম) ফুড ক্রপস পরীক্ষায় আপত্তি জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রাইজাল কমিটি অবশ্য দরাজহাতে ছাড়পত্র দিয়েছে বহুজাতিক সংস্থাটিকে। সেই দৌলতেই তারা প্রগতিশীল রাজ্য বলে পরিচিত গুজরাটের কাছে আবেদন করেছিল। গুজরাট জানিয়েছে, খাদশস্য নিয়ে পরীক্ষা করা যাবে না, তুলোর মতো অ-খাদ্য নিয়ে করা যেতে পারে।

আ·হ·র·ণ

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

এ বছর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের জন্মশতবর্ষ। ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা সবারই জানা। বাংলায় নবজাগরণের অন্যতম হোতা ডিরোজিও সম্পর্কে তাঁর এই অসাধারণ লেখাটি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁকেও শ্রদ্ধা জানানো হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের বৌদ্ধিক আন্দোলনে ডিরোজিওর ভূমিকা নিয়ে গবেষণায় প্রধান সমস্যা সে বিষেয়ে মুদ্রিত কিংবা হস্তলিপির নথিপত্রের একান্ত স্বল্পতা। ডিরোজিও কোনো দিনলিপি রাখতেন না, এবং যদি তেমন কিছু রেখেও থাকেন, তার একটি পাতারও এখন আর অস্তিত্ব নেই। তাঁর প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদি– তারও সংখ্যা খুব বেশি নয়, এখনও সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং একটি খণ্ডে প্রকাশ করা হয়নি। যে সব সংবাদপত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, তাতে প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলিও একত্রে পাওয়া যায় না। ব্র্যাডলি ব্রিট ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কবিতার যে সঙ্কলন করেছিলেন, তাতেও তাঁর জীবন ও চিন্তার অল্প কয়েকটি মাত্র দিকের কথা জানা যায়, তাঁর সকল চিন্তাভাবনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় সেখানে নেই। যে জিনিসের অভাব আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি, সেটা হল স্মৃতিকথা অথবা প্রবন্ধের আকারে তাঁর ছাত্রদের একগুচ্ছ রচনা। শিষ্য হিসাবে যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, ডিরোজিওর চিন্তা-ভাবনায় যথাযোগ্য সাড়া দিয়েছিলেন, নব্য বঙ্গের নেতা হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর শিক্ষাকে যে মূল্য দিতেন, কোথায়ও তার কথা লিখে যাননি। এমনকি ডিরোজিওর পরিবারের যাঁদের জীবনের অবসান হয় দারিদ্র্যের মধ্যে, তাঁদেরও দেখাশোনা করেননি ডিরোজিওর শিষ্য ও অনুগামীরা। সাউথ পার্ক স্ট্রিটের সমাধিক্ষেত্রের এক অচিহ্নিত স্থানে ডিরোজিওর যে সমাধি, তারও কোনও যত্ন তাঁরা নেননি এই শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত।

ক্রিস্টান মিশনারিরা তাঁর কথা লেখেননি, কারণ তাঁদের খ্রিষ্টীয় কর্তব্য সম্পর্কে ডিরোজিওর কোনও আগ্রহ ছিল না। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা এত মানী লোক ছিলেন যে, একজন ইউরোপীয় ইনটেলেকচুয়ালকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর, শিক্ষিত বাঙালি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা কম ছিল না যাঁদের চোখে তিনি একজন অবাধ্য বিদ্রোহী ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না, যিনি অল্পবয়সীদের অপরিণত মস্তিষ্কে, বিদেশ থেকে আমদানি করা চিন্তা-ভাবনা প্রবেশ করিয়ে দিতে খুব পটু ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যেটা, সেটা হল, যে কলেজে তিনি পাঁচ বছর বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছেন, সেই কলেজের গভর্নিং বডির হিন্দু সদস্যেরা যখন স্পষ্টত অমূলক অভিযোগ তাঁর নামে আনলেন, সেই অবাধ্য বিদ্রোহী যুবকেরা একত্র হলেন না তাঁদের সেই সব অশাস্ত্রীয় ভাবনা-চিন্তার যিনি জনক, তাঁকে রক্ষা করতে। ১৮৮৪ সালে টমাস এডোয়ার্ডস্-এর লেখা ডিরোজিওর জীবনী যখন বেরোল, তত দিনে তাঁর মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দীর বেশি অতিবাহিত হয়ে গেছে। কাজেই ডিরোজিওর সমসাময়িক বিবরণ অথবা নবী-পত্রের দ্বারা সে জীবনী প্রমাণিকতা লাভ করেনি।

আমরা কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে পারি। ১৮৩১-এর ৩০ ডিসেম্বর তারিখের *ইন্ডিয়া গেজেট*-এ ডিরোজিওর বোন অ্যামিলিয়া যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তাঁর ভাইয়ের একটি জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশে সহায়তা চেয়ে, ডিরোজিওর ছাত্রেরা কেন তাতে যথাযোগ্য সাড়া দিলেন না? যে ডিরোজিও মেমোরিয়াল কমিটি ৫ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখে প্যারেন্টাল অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় গঠিত হয়েছিল, তাঁরা কেন একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কোনো ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হলেন? আমার মনে হয়, ডিরোজিওর ছাত্রেরা, তাঁর জীবনকালে যতই অনুগত হয়ে থাকুন, পরবর্তী জীবনে, ক্রমে, তাঁকে ভুলে যান; এবং নানা

ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি তাঁদের ঋণের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করার কোনও অবসর খুঁজে পান না। আমার মনে হয় ডিরোজিও সম্পর্কে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা '*The Calcutta Literary Gazett*'-এ ১৮৩৩-এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ জন গ্রান্ট-এর লেখা। E.W.Madge-এর *Henry Derozio, The Eurasian Poet and Reformer*-এ (১৯০৫-এ প্রকাশিত) উল্লিখিত এই রচনাটি আমি পড়িনি। তার আগে দুটি দীর্ঘ শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩১-এর *The Government Gazette*-এ, এবং *সমাচার দর্পণ*-এ। এ দুটি থেকেই উদ্ধৃতি আছে টমাস এডোয়ার্ডস্-কৃত ডিরোজিওর জীবনীতে। বলা বাহুল্য, ডিরোজিওর সম্পর্কে প্রথম দিকের এই সব রচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের নবজাগরণে তাঁর অবদানের কথা কিছু বলা সম্ভব ছিল না, কেন না সেই আন্দোলনের ফল সেই শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকের আগে ফলতে শুরু করেনি। *The Government Gazette*-এর প্রবন্ধে ডিরোজিওর 'দুর্বিনীত স্বভাব', 'অবিমৃষ্যকারিতা' এবং 'ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্তিতা'র কথা আছে। কিন্তু প্রবন্ধের লেখক তা ছাড়াও লিখেছেন, ডিরোজিওর নৈতিক চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক, সত্য বলে তিনি যা জানতেন, তার প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল এমন ঐকান্তিক যে তাকে প্রায় রোমান্টিক আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাধু এবং পুত্র হিসাবে, ভ্রাতা হিসাবে, বন্ধু হিসাবে এবং যে সমাজের উন্নয়ন এবং যাকে উচ্চতর চরিত্র দান করা ছিল তাঁর সবচাইতে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, সেই সমাজের সদস্য হিসাবে তাঁর আচরণ ছিল সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে। *সমাচার দর্পণ*-এ প্রকাশিত শোকসংবাদে ছাত্রদের ওপর তাঁর প্রভাবের আরেকটু গভীরে প্রবেশ করা হয়: '**যতদিন তিনি হিন্দু কলেজে ছিলেন তাঁর শিক্ষাধীন যুবকদের মনের মধ্যে বিজ্ঞানের যথার্থ নীতিসমূহ প্রবেশ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন। তাঁর শিক্ষার ফলে, তাঁর ছাত্রেরা শিক্ষাদীক্ষায় তাঁদের অন্যান্য স্বজাতীয়ের চেয়ে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি করেছিলেন। সেই আলোকপ্রাপ্ত যুবকের দলই থেকে গেলেন তাঁর স্মৃতিসৌধ রূপে, যার দ্বারা কলকাতা দীর্ঘকাল তাঁকে মনে রাখবে।**' শতাব্দীর শেষে ডিরোজিও সম্পর্কে কী বলা আরম্ভ হবে তার একটা পূর্বাভাস এখানে পাওয়া যায়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও কেউ কেউ, ইংরেজি এবং বাংলা দু ভাষাতেই রচনায় যাঁরা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা এ কথা আগেই স্মরণীয় ভাষায় বলতে পারতেন।

নব্যবঙ্গের জনক হিসাবে ডিরোজিওকে কে তুলে ধরেছিলেন? নবজাগরণ যদিও ওই শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত পুরোদমে আরম্ভ হয়নি, আমরা যাকে 'ইয়াং বেঙ্গল' বলি, চল্লিশের দশকেই তার আবির্ভাব ঘটে এবং এর প্রভাব জনজীবনে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে পঞ্চাশের দশকে। *The Calcutta Review*-এ ১৮৮২-তে প্রকাশিত 'History of Native Education' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের কথা ম্যাজ উল্লেখ করেছেন। তাতে লেখক ডিরোজিও সম্পর্কে বলেছেন, এই নতুন যুগের আত্মার তিনি ছিলেন একাধিপতি। আরও বলেছেন, কিছু কাল এই প্রতিভাশালী যুবক ছিলেন নব্যবঙ্গের মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ। তাঁদের হৃদয়ে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করবার মতো কেউ ছিল না। প্রবন্ধটি আমি পড়িনি, এবং আমার বিশ্বাস আমাদের ডিরোজিওবিষয়ক পণ্ডিতেরা প্রবন্ধটি শুধু যে পড়েছেন তাই নয়, তার লেখক কে তাও আবিষ্কার করেছেন। আমার মনে হয়, এই আখ্যাটি, 'নব্যবঙ্গের মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ' (Oracle of Young Bengal) 'ডিরোজিও-চর্চা'র ইতিহাসে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে এমন কথা আর কেউ বলেছেন বলে আমি জানি না। এমনকি চল্লিশের দশকেও, এমন কথা কেউ মনে করেননি যে, এক প্রজন্মের যুবশক্তি, যাঁরা সবাই দেশের পুনর্জাগরণের জন্যে সচেষ্ট ছিলেন, ডিরোজিও ছিলেন তাঁদের গুরু। এমনকি ডেভিড ড্রামন্ড, যিনি নিজের হাতে ডিরোজিওকে তৈরি করেছিলেন, তিনিও ১৬ আগস্ট, এবং ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৪০-এর *Weekly Examiner*-এ ডিরোজিও সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে এ কথা বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন, 'ডিরোজিও হিন্দু কলেজকে প্রাণ ও অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন। সেই কারণে হিন্দু কলেজ তার প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির জন্যে তাঁর কাছে ঋণী।'

এ সত্যিই বড় আশ্চর্যের কথা যে, ডিরোজিওর সম্পর্কে, তাঁর শিক্ষাদানের রীতির ও তাঁর ছাত্রদের ওপর প্রভাব সম্পর্কে হরমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর হিন্দু কলেজের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপিতে যে সব অতিশয় অর্থপূর্ণ কথা বলেছেন, সে দিন আর কেউ কোনোভাবে সে কথা বলেননি। হরমোহন নিজে যা দেখেছেন এবং জেনেছেন তাই লিখেছেন। তাঁর পুত্র চণ্ডীচরণের সাহায্যে সে পাণ্ডুলিপি টমাস এডোয়ার্ড-এর হস্তগত হয়। এডোয়ার্ড সেখান থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*-এ (১৯০৩) তার কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। আমি এডোয়ার্ডস্-কৃত জীবনীতে উদ্ধৃত একটি অংশমাত্রের এখানে উল্লেখ করছি। হরমোহন বলেছেন, **১৮২৯-এর মে মাসে ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে ডেভিড হিউম-এর চিন্তা-ভাবনার ব্যাপক প্রচার হয়েছিল, এবং যথেষ্ট সমাদরও হয়েছিল। আমার মনে হয়, যে পাঁচ বছর ডিরোজিও হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন, সেই সময়ে সৃষ্ট বৌদ্ধিক বাতাবরণে ডেভিড**

হিউম-এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ, এই পর্বে বঙ্গদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যে মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, ডেভিড হিউম-এর সন্দেহবাদী চিত্তবৃত্তি ছিল ঠিক তার বিপরীত। যাঁরা ডিরোজিওর বৌদ্ধিক শক্তি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, ছাত্রদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার তাঁর ক্ষমতার প্রশংসা করতেন, তাঁরাও যে সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তকদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করেননি তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' পুস্তকে। ডিরোজিওর মৃত্যুর মাত্র ন বছর পরে রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ডিরোজিওর দেশপ্রেমের তিনি প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, একজন ফিরিঙ্গির পক্ষে এই দেশপ্রেম অসাধারণ। রাজনারায়ণ বলেছেন, 'তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না।' তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, ডিরোজিওর মধ্যে ভারতীয় হিসাবে দেশপ্রেম অনেক ভারতীয়ের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু রাজনারায়ণ এ কথা বলেননি যে নব্যবঙ্গের তিনি একজন স্রষ্টা ছিলেন। বরং বলেছেন, ডিরোজিও যে সব পাশ্চাত্ত্য ধারণা ছাত্রদের মাথায় প্রবেশ করিয়ে দেন, তাতে তাঁদের মাথা ঘুরে যায়। বস্তুত, পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে প্রাপ্ত হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ইয়াংবেঙ্গল-এর যে ক্রমবর্ধমান অশ্রদ্ধা, রাজনারায়ণ তার জন্যে ডিরোজিওকেই দায়ী করেন। আমার মনে হয়, শিবনাথ শাস্ত্রীও সে যুগের তরুণমনের ওপর ডিরোজিওর যে প্রভাব, তার জন্যে তাঁকে খুব উচ্চ স্থান দেননি। হিন্দু কলেজের পরিচালকবর্গ যে তাঁর নামে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন এবং কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী থেকে তাঁকে বহিষ্কার করেছিলেন, তার কারণ নাকি বৃন্দাবন ঘোষাল নামক একজনের রচনা করা ডিরোজিওর শিক্ষা সম্পর্কে নানা কুৎসা। বস্তুত বাঙালীর মনের মধ্যে এই বৃন্দাবন ঘোষালের কিছু কিছু উপাদান থেকে গেছে বলেই বাঙালী অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ডিরোজিওর প্রতি উদাসীন থেকেছে।

এমনকি মিশনারিরা, নানা বিষয়ে বিপরীত মতামতের জন্যে যাঁদের ডিরোজিওর বিরোধী হওয়ার কথা, তাঁরাও তাঁর বৌদ্ধিক শক্তি ও ছাত্রদের ওপর প্রভাবের জন্যে, আমাদের বাঙালি হিন্দুদের চেয়ে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা বেশি করেছেন। যেমন, আলেকজান্ডার ডাফ তাঁর শিক্ষাদান সম্পর্কে বলেছেন, 'ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের উপমা যদি দেওয়া যায়, ডিরোজিওর ক্লাসের সঙ্গে অ্যারিস্টটল-এর আকাডেমি এবং প্লেটো-র লাইসিয়াম-এর সাদৃশ্য ছিল বেশি। অধ্যাপকের সঙ্গে ছাত্রদের চিন্তার আদান-প্রদান ছিল অবাধ; এবং তরুণ ছাত্রদের মন তথ্য দিয়ে ঠাসা হত না, বরং তাদের শেখানো হত চিন্তা করতে, বিচার করতে।'

আমার মনে হয়, ডিরোজিও ছিলেন নব্যবঙ্গের মন্ত্রদাতা পুরুষ, এই যে ধারণা The Calcutta Review-তে ব্যক্ত হয়েছিল, সেটাকেই আরও বিস্তার সহকারে আমাদের বৌদ্ধিক ইতিহাসে ডিরোজিওর ভূমিকার অকুণ্ঠ প্রশংসার আকারে বিবৃত করেন ভোলানাথ রায় (যিনি ১৮৩২ সালে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেছিলেন)। ভোলানাথ, আমরা যাকে বলি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, তার প্রবক্তা ছিলেন। সংস্কৃতের তিনি নিন্দা করেছিলেন, কারণ, The Travels of a Hindu-তে (১৮৬৯) তিনি বলেছেন, বাংলা ভাষায় 'Patriotism'-এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। পরে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে বলেন, তারা যেন ব্রিটিশ সামগ্রী না ক্রয় করে, কেননা একমাত্র সেইভাবেই 'King Cotton of Manchester'-কে সিংহাসনচ্যুত করা যাবে। জুলাই ১৮৯৪-এর Calcutta University Magazine-এ প্রকাশিত ডি এল রিচার্ডসন-এর সম্পর্কে এক প্রবন্ধে ভোলানাথ বলেছেন, 'কালক্রমে ডিরোজিওর ধারণা-ভাবনাসমূহ এক অবিস্মরণীয় নৈতিক বিস্ফোরণ ঘটাল। সংক্ষেপে, তিনি সমাজ সংস্কারক নব্যবঙ্গকে লালন-পালন করে, পরিপুষ্ট করে, সামনে এগিয়ে দিলেন।'

এখানে এসে এখন আমাদের একটি প্রশ্ন নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। তাঁর শিক্ষা যে এই ফল প্রসব করবে, ডিরোজিও কি জানতেন? অর্থাৎ তিনি কি ভেবেছিলেন, তিনি বঙ্গদেশে, তাঁর শিক্ষার দ্বারা, এমন এক বৌদ্ধিক বাতাবরণ সৃষ্টি করবেন, যার ব্যতিরেকে সামাজিক পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়? তাঁর জীবনের বিষয়ে যতটুকু আমরা জানি, তার মধ্যেই এমন অনেক কিছু আছে, যা থেকে বোঝা যায়, এই কাজে তিনি যথার্থই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। একটি মোটামুটি লোভনীয় চাকরি ছেড়ে তিনি হিন্দু কলেজে যোগ দেন এবং তাঁর ছাত্রদের জন্যে তিনি যা করেন, সর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষকেরাও তাঁদের ছাত্রদের জন্যে তত করেন না। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে তাঁর লেখা সনেটটিতে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আশা তিনি ব্যক্ত করেছেন, তত বড় আশা শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের সম্পর্কে পোষণ করেন না। মনে এবং চিত্তে ছাত্রেরা বড় হয়ে উঠছে, দেখতে তিনি ভালবাসতেন : 'Expanding like the petals of young flowers/ I watch the gentle opening of your minds./ I looked forward to their Fame in the mirror of futurity/ Weaving the chaplets you have yet to gain./And then I feel I have not lived in vain.'

(ভাবার্থ: নবীন ফুলের পাপড়ির মতো তোমাদের মন যেভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, আমি দেখি, ভবিষ্যতের আয়নায় তোমাদের খ্যাতি দেখব বলে আমি আশা করে আছি, দেখছি,

তাদের ভবিষ্যতের জয়মালা গাঁথা হচ্ছে। দেখে আমি বুঝতে পারি আমার জীবন বৃথা যায়নি।)

ছাত্রদের সম্বন্ধে মহত্তর আশা ব্যক্ত হয়েছে ডেভিড হেয়ার-এর প্রতিকৃতির উদ্দেশে রচিত তাঁর সনেটে : 'Your hand is on the helm - guide on young men/... Your glories are but budding; they shall bloom/Like fabled amaranths Elysium, when the shore is won even now within your ken/And when your torch shall dissipatie the gloom.'

(ভাবার্থ: যুবকদের জীবনতরীর হাল তোমার হাতে ... তোমার যশ-গৌরবের কোরক সবে উদ্গত হতে আরম্ভ করেছে, স্বর্গের পারিজাতের মতো সে সব ফুল ফুটে উঠবে যখন তোমার মশাল দূর করবে অন্ধকার।)

ডিরোজিও জানতেন তিনি একটি মশাল জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। এ দেশের মানুষের সঙ্গে নিজেকে তিনি অভিন্ন মনে করতেন। মনে করতেন তিনি তাদেরই একজন। ভারতীয় দেশভক্তির তিনিই প্রথম কবি এবং যদিও হিন্দু কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করার পর ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের জন্য কিছু কিছু কাজ তিনি করেছিলেন, তাদের জন্যে কাজ করাকে জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে তিনি কখনও মনে করেননি। এ কথা ঠিক, তাঁর দেশপ্রেমের কবিতায় ভারতের অতীতের যে গৌরবের তিনি জয়গান করেছেন, তার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান তাঁর কমই ছিল, এবং সে অতীত গৌরবের কথা তিনি পড়েছিলেন উইলিয়াম রবার্টসন-এর *Disquisition on India* (1791)-তে। স্কটল্যান্ডীয় ইতিহাসবিদ রবার্টসন ছিলেন ডিরোজিওর শিক্ষক ড্রামন্ড-এর প্রিয় লেখকদের অন্যতম। এই গ্রন্থে রবার্টসন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, ভারতবাসীদের প্রতি তাঁরা যেন নির্দয় ব্যবহার না করেন, যে ভারতবাসীদের সভ্যতা তাঁদের সভ্যতার চেয়ে মহত্তর। মহান ভবিষ্যৎ যারা গড়তে চায় তাদের এই নিজেদের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ থাকা দরকার। ডিরোজিওর এই যে বিশ্বাস নিজের ছাত্রদের ওপর, এ ছিল জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশারই এক অঙ্গ। আমার মনে হয়, এই বিশ্বাসের সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায় সতী-প্রথার উচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর কবিতার শেষ স্তবকে।

'But with prophetic ken, dispelling fears/Which haunt the mind that dwells on nature's plain./The Bard beholds the mist of coming years./A rising spirit speaking peace to man./The storm is passing and the rainbow's span stretcheth from North to South; the ebon car/Of darkness rolls away; the breezes fan/ The infant dawn, and morning's herald star/ Comes trembling into day:O can the sun be far?'

(ভাবার্থ: কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির বিধানে মানুষের জন্যে কী ভবিষ্যৎ লেখা আছে সেই ভেবে যারা ভীত হয়, কবির ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তাদের সে ভয় দূর করে দিল, কবি অনাগত বৎসরগুলির কুয়াশার ওপর দৃষ্টি স্থাপন করলেন, দেখলেন একটি নবোত্থিত আত্মা মানুষকে শান্তির বাণী শোনাচ্ছে। দুর্যোগের অবসান হয়েছে, রামধনু প্রসারিত হয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত, অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণ রথ চলে গেছে। কম্পিত শুকতারা প্রত্যুষের আগমনবার্তা নিয়ে উপস্থিত, আর কি দূরে থাকতে পারে সূর্যোদয়?)

সূর্যোদয় তিনি দেখে যেতে পারেননি। যেমনভাবে তিনি চেয়েছিলেন তেমনভাবে সূর্য হয়ত উদিতও হয়নি। কিন্তু তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল সূর্যোদয়ের অতন্দ্র প্রতীক্ষা, দূরের আকাশে তিনি তার আলোকাভাস বোধহয় দেখেছিলেন।

বুঝলাম, ডিরোজিও বোধ করতেন তাঁর জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে; নিজের ছাত্রদের এক মহান জাতীয় কর্তব্যে আহ্বান করবার তাঁর ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তার পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, এবং যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সহজ নয়। প্রশ্নটি হল, মাত্র বাইশ বছর আট মাসের আয়ুষ্কালে এবং পাঁচ বছরের শিক্ষকতা জীবনে বৌদ্ধিক মুক্তির জন্যে এত কাজ করবার ক্ষমতা তিনি পেলেন কোথায়? শুধুমাত্র 'অকালপক্কতা', তা সে যতই হোক, তা দিয়ে এর ব্যাখ্যা হয় না। কিটস্ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেট 'On looking into Chapman's Homer' লিখেছিলেন বিশ বছর বয়সে। কিন্তু এখন আমরা কবি ডিরোজিওর মূল্য বিচার করছি না। বস্তুত, যে কবিতা তাঁর জীবন, শিক্ষক হিসাবে তাঁর কাজ, তাদের মূল্য, যে কবিতা তিনি লিখে যেতে পেরেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি। অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর মননশক্তি; অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন না, কিন্তু কথোপকথনে পারদর্শী ছিলেন। পড়াশোনায় বিচক্ষণ ছিলেন এবং তাঁর মনের গ্রহণশক্তি এমন ছিল যে শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা অন্যদের চেয়ে দ্রুত অধিগত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষক কারা ছিলেন, সেই সব লেখকদের বইয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কারা করিয়ে দিয়েছিলেন? ক্লাসে তিনি কোন লেখকদের নিয়ে কথা বলতে ভালবাসতেন আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু জানি দর্শনে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি যুক্তি-তর্কে অতিশয় কুশলী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন দার্শনিকের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন? ড. উইলিয়াম হজ্, মিল্, যিনি পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিব্রুর রিজিয়াস প্রফেসার হয়েছিলেন, কলকাতায় এক জনসভায় বলেন, 'ডিরোজিও কান্টের দর্শন সম্পর্কে যে সমস্ত আপত্তি

ব্যক্ত করেছেন, সে সবই সম্পূর্ণ মৌলিক, এবং তাতে যুক্তি প্রয়োগের এবং পর্যবেক্ষণের যে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা কোনও প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিকেরও অগৌরবের কারণ হত না।' কিন্তু ডিরোজিও যখন কান্টের দর্শনের বিষয়ে তাঁর আপত্তির কথা লেখেন, সেই সময় সেই জার্মান দার্শনিক অবশ্যই তাঁর গুরু ছিলেন। আসলে কিন্তু ডিরোজিওর গুরু ছিলেন সেই দার্শনিক যাঁর সম্পর্কে কান্ট বলেছিলেন, তিনি কান্টকে 'মতান্ধতার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়েছেন'। কান্ট এ কথা লেখেন ১৭৫৮-তে প্রকাশিত একটি বই পড়ে, যার নাম *An Enquiry Cocerning Human Understanding* . সন্দেহবাদী স্কটীয় দার্শনিক ডেভিড হিউমের দর্শন অত উত্তমরূপে অধিগত করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর নিজের সন্দেহবাদী দর্শনের ভিত্তি তার ওপরে স্থাপন করতে পেরেছিলেন, সে তাঁর শিক্ষক ন্যুজদেহ স্কটীয় ধর্মযাজক, যিনি ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে আট বছর তাঁকে পড়িয়েছিলেন, সেই ডেভিড ড্রামন্ডের জন্য। এ সত্যিই দুঃখের বিষয় যে, ড্রামন্ড, যাঁর প্রভাব ডিরোজিওর ওপর অত ব্যাপক ও গভীর হয়েছিল, তাঁর বিষয়ে আমরা খুবই সামান্য জানি।

সি.ই. বাকল্যান্ড-এর *Dictionary of Indian Biography* (১৯০৬)-এ ড্রামন্ড-এর সম্বন্ধে একটি লাইনও নেই। এইচই এ কটন তাঁর Calcutta Old and New পুস্তকে ড্রামন্ড-এর উল্লেখ করেছিলেন এই বলে যে, গত শতাব্দীর যে চল্লিশের দশক অনেকের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছিল, তখন যে সব কীর্তিমান পুরুষের মৃত্যু হয়, তাঁদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা বিস্মৃত ব্যক্তি। সঙ্গত কারণেই কটন ড্রামন্ডের পরিচয় দেন এই বলে যে তিনি ডিরোজিওর শিক্ষক এবং একজন খামখেয়ালি স্কটীয় ধর্মযাজক, যিনি ধর্মতলায়, এখন যেখানে ডেভিড হেয়ারের আস্তাবল, তার কাছে একটি ইস্কুল চালাতেন। ড্রামন্ড ছিলেন একজন কবি, এ কথাও কটন বলেছেন। তাঁর কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুকালে তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর মাতৃভাষা ডোরিক-এ কবিতাগুলি স্কটল্যান্ড-এ প্রকাশিত হোক। কিন্তু যে জাহাজে সে সব কবিতা যাচ্ছিল সে জাহাজটি ডুবে যায়। ফলে, টমাস এডোয়ার্ডস্-এর কথায়, 'বার্নস এবং ট্যানাহিল-এর পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কিছু স্কটীয় গীতিকাব্যের বিনাশ ঘটে।'

ড্রামন্ড-এর কতটা প্রভাব তাঁর ছাত্র ডিরোজিওর ওপর পড়েছিল, তা যখন যাচাই করতে যাই, দেখি হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপকটি যাঁকে গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন, তিনি ছিলেন স্কটীয় নবজাগরণের সন্তান।

টমাস এডোয়ার্ডস্ তাঁর ডিরোজিও-জীবনীতে লিখেছেন, 'কলকাতায় রক্ষণশীল অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে মনে করতেন ড্রামন্ড খোলাখুলি ডেভিড হিউমের শিষ্য যদি নাও হন, তাঁর হাতে নিজেদের ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। তার মানে, ড্রামন্ড তাঁর ছাত্র ডিরোজিওর মতোই রক্ষণশীল খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের সন্দেহভাজন ছিলেন। ড্রামন্ডের সম্বন্ধে এডোয়ার্ডস্ বলেছেন, 'তিনি কিছুই বিশ্বাস করতেন না, কিছুই মেনে নিতেন না, যদি সেটি কোনো গাণিতিক উপপাদ্যের মতো, স্বতঃসিদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত না হয়।' তারপর এডোয়ার্ডস্ আরও বলেছেন, 'তাঁর স্বাস্থ্য যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াত, যদি সে রকম অবসর পেতেন, যত দূর সম্ভব ড্রামন্ড সন্দেহবাদী দার্শনিক হিসাবে তাঁর স্বনামধন্য স্বদেশবাসী ডেভিড হিউম-এর সমকক্ষ হয়ে উঠতেন।' স্মর্তব্য, হরমোহন তাঁর হিন্দু কলেজের হস্তলিখিত ইতিহাসে বলেছেন, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের ডেভিড হিউমের চিন্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮৮৩ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে ড্রামন্ড যখন দেশত্যাগ করেন, টমাস রিড এবং ডুগালড স্টুয়ার্ট তার আগেই ডেভিড হিউমের সন্দেহবাদী দর্শন সম্পর্কে তাঁদের প্রবল আপত্তি ব্যক্ত করেছেন, এবং সেই সূত্রে রক্ষণশীলতার সপক্ষে যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করেছেন। টমাস রিড গ্লাসগোতে ১৭৬৩-তে অ্যাডাম স্মিথ-এর স্থলে নৈতিক দর্শনের অধ্যাপক পদে বৃত হন, এবং পরের বছর তাঁর An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, Treatise of Human Nature-এ ডেভিড হিউম যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার ওপর চরম আঘাত হানা। ডুগালড স্টুয়ার্ট-এর তিন খণ্ডের Philosophy of the Human Mind-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় যে বছর ড্রামন্ড ভারতের উদ্দেশে স্কটল্যান্ড থেকে রওনা হন। কিন্তু এই যে রক্ষণশীলতা এবং বিশপশাসিত চার্চের কিছু পরিমাণ আধিপত্য, তার মধ্যেও এমন স্কটল্যান্ডবাসী ছিলেন যাঁরা ১৭৪৮-এর যে আইন 'উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তব্য ক্ষমতা'-র বিলোপ ঘটায়, সেই আইনের বলে স্বাধীনতা পেয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে ভিন্নমতাবলম্বী ছিলেন। খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের দীক্ষিতকরণে আগ্রহের পুনরুজ্জীবন তাঁদের বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়ে স্বাধীনতার প্রতি নিজেদের আনুগত্য ঘোষণা করতে তাঁরা কোনও দ্বিধা করেননি। ড্রামন্ড ছিলেন ডেভিড হিউমপন্থী সন্দেহবাদী এবং স্বাধীন চিন্তক; কবি হিসাবে তিনি গুরু বলে মানতেন বার্নস-কে। তাঁর কোমল মানবতাবোধের মূল নীতি ছিল বার্নস-এর 'A man's man for a' that' তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি ইউরোপীয়, ভারতীয় এবং ইউরেশীয়দের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ করতেন না।

শোনা যায়, ড্রামন্ড স্কটল্যান্ড ত্যাগ করেন তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করে তিনি চার্চে যোগ দিতে পারেননি বলে। ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ সম্পর্কে এই যে বিবেকপ্রসূত আপত্তি, এর সঙ্গে সম্ভবত কিছু অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাও যুক্ত হয়েছিল। চাষবাসের যে প্রচলিত ব্যবস্থা, run-rig system, যাতে একটি বড় জমির এক এক ফালি এক একজন যৌথভাবে চাষ করত, তার অবসান ঘটে। তার ফলে বহু সংখ্যক প্রজা (tenant) দেশ ছেড়ে বিভিন্ন উপনিবেশে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে, এই নতুন কৃষিব্যবস্থায় ড্রামন্ড পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই।

ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে যে আট বছর ডিরোজিও ছিলেন, তার সম্পর্কে আমরা সামান্যই জানি, কিন্তু তা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, ড্রামন্ড তাঁর দর্শন ও তাঁর কাব্য তাঁর ছাত্র ডিরোজিওকে দান করে যান। তাঁরা দুজনেই ছিলেন মানবতাধর্মী সন্দেহবাদী, যদিও ঐতিহাসিক বিচারে তাঁরা নিকটতর ছিলেন রিড এবং ডগালড স্টুয়ার্ট-এর সন্দেহবাদবিরোধী দর্শনের। এইচ এইচ উইলসনকে লেখা তাঁর সেই ঐতিহাসিক চিঠি, যাতে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের 'ম্যানেজারদের' আনা অভিযোগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমুন্নতভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন, তাতে দেখা যায় তিনি সর্বান্তঃকরণে একজন সন্দেহবাদী। নিরন্তর নির্যাতনের মধ্যেও স্থিতধী, এমন এক চিত্তের গদ্যকাব্য হিসাবে, তাঁর কাব্যসংকলনের পরিশিষ্টে এই চিঠিটির স্থান পাওয়া উচিত। 'সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার আক্রমণ এমনভাবে আমাদের ঘিরে ধরেছে,' (এই চিঠিতে ডিরোজিও বলেছেন) 'যে নিজের মতের সত্যতায় অন্ধ বিশ্বাসের দুঃসাহসকে কোনও জিজ্ঞাসু মনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় না।' এ নিঃসন্দেহে ডেভিড হিউম-এর কণ্ঠস্বর। এবং ডিরোজিও বিশ্বাস করতেন, সনাতন পন্থার যে মতান্ধতা, তাঁর দেশের নানা দুর্গতির জন্যে যা দায়ী, সন্দেহবাদই তার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। খ্রিস্টান মিশনারি, যাঁরা আমাদের ধর্মান্তরিত করে থাকেন, তাঁরাও নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত হিন্দুদের মতোই এই মতান্ধতায় আক্রান্ত।

কিন্তু ডিরোজিও জানতেন, সন্দেহবাদও এক ধরনের মতান্ধতায় পরিণত হতে পারে। সেই কারণেই (এইচ এইচ উইলসনকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন) ছাত্রদেরকে তিনি রিড এবং ডুগালড স্টুয়ার্ট-এর যে সব ঈশ্বরবাদী যুক্তি, বিনা দ্বিধায় সে বিষয়েও পাঠ দান করেছেন।

স্টুয়ার্টের দর্শন সম্পর্কে ডিরোজিওর আগ্রহের আরও একটি কারণ ছিল। স্টুয়ার্টের খ্যাতি ছিল সাধু চরিত্রের জন্যে, বাকে এবং আচরণে সত্যনিষ্ঠার জন্যে। ডিরোজিওর চরিত্র সম্পর্কে যত কিছু শোনা যায়, তা থেকে মনে হয় আচরণে তাঁর ন্যায়পরায়ণতায় কোনও খাদ ছিল না। ডুগালড স্টুয়ার্ট তাঁর সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন, 'ছাত্রদের এক একটি সমগ্র প্রজন্মের মধ্যে তিনি নৈতিক উৎকর্ষের প্রতি ভালবাসার জন্ম দিয়েছেন।' একই কথা ড্রামন্ডের সম্পর্কেও বলা যায়।

ডিরোজিওর যে বয়স, সে বয়সে তিনি চিন্তার কোনও তন্ত্র রচনা করবার প্রয়াস করেননি, কোনও দার্শনিক মতবাদ তো নয়ই। সম্ভবত দীর্ঘ জীবন লাভ করলেও তিনি কোনও সুসংহত চিন্তাতন্ত্র রচনায় আগ্রহী হতেন না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন বৌদ্ধিক চেতনা, এক স্বাধীন জিজ্ঞাসু মনের জন্ম দিতে। তাঁর ধারণা ছিল, একমাত্র তা হলেই তাঁর দেশবাসীকে তাদের মতান্ধতার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলা যাবে। টমাস পেইন-এর Age of Reason তাঁর মতে মূল্যবান, কারণ খ্রিষ্টধর্ম এবং নিরীশ্বরবাদ, এই উভয়ের ওপরই এ বই আক্রমণ করেছে। কিন্তু মোটের ওপর ডিরোজিওর ঝোঁকটা ছিল অনুগ্র সন্দেহবাদের দিকে; এবং ধর্মশাস্ত্রসংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর কোনও স্পৃহা ছিল না। যা তিনি চাইতেন তা হল, তাঁর ছাত্রদের জিজ্ঞাসু মনকে জাগিয়ে তুলতে। তাঁর ধারণা ছিল, একমাত্র তা হলেই জাতির সামাজিক ও নৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটবে। কারণ কোনও রাজনৈতিক কার্যক্রমের যেহেতু তিনি প্রবর্তন করেননি, কোনও সামাজিক সংস্কারের সূত্রপাত করেননি, অতএব বলা যায়, নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক মতবাদ প্রবর্তন করার চেয়ে তাঁর চেষ্টা ছিল নতুন এক বৌদ্ধিক মনোভাবের সৃষ্টি করবার। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই নতুন বৌদ্ধিক চেতনা থেকে যথাসময়ে বেরিয়ে আসবে এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় সামাজিক আন্দোলনের পরিকল্পনা। তাঁর একটি সনেটে তিনি সে কথাই বলেছেন : 'With all that even in thought is good, must be/Best formed for deeds like those which shall be done/By you hereafter till your guerdon is won/and that which now is hope becomes reality.'

(ভাবার্থ: এমনকি চিন্তাতেও যা কিছু বলি, তাকেই শ্রেষ্ঠ আকার দিতে হবে সেই সব কাজের জন্য, যা তোমাকে ভবিষ্যতে এনে দেবে তোমার পুরস্কার যাতে তোমার আজকের আশা হয়ে উঠবে বাস্তব।)

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন: ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ১৭ এপ্রিল ১৯৮৪-তে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা বৈঠকে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।)

ঋণস্বীকার: টপ কোয়ার্ক, আগস্ট- নভেম্বর ২০০২

ভাতের থালায় লুকিয়ে থাকা শ্বেত শয়তান

গৌতম মিস্ত্রি

ইংরেজি ভাষায় একটা প্রবচন আছে— 'The whiter the bread, the sooner you're dead', মানে রুটি (প্রকারান্তরে ভাত) যত সাদা হবে, আপনি তত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন। ভাত সাদা হবে না তো কি লাল হবে? ভ্রূকুঁচকে গেলেও প্রস্তাবটা তেমনই। কিছু কিছু দেশে লালভাতের কদর সাদা ভাতের চেয়ে বেশি। যেমন চীন ও থাইল্যান্ড। শ্রীলঙ্কায় পাঁচতারা হোটেলে ভাত চাইলে লালভাতই পাওয়া যাবে। অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীরা ঘাসপাতা বেছে খেলেও শস্যদানা আস্তই খেয়ে এসেছে, এখনও তাই খায়। বেশি বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষ প্রথম প্রথম কী করেছিল জানা নেই। কালের বিবর্তনে ক্রমশ ঘাসজাতীয় গাছের বীজ অর্থাৎ ধান ও গমের খোসা ছাড়িয়ে খাবারের স্বাদ পেয়ে গেল। এতে যদি খাবার চিবনো আর হজম করা সহজ হল, আর শস্যবীজের খোসার মধ্যে থাকা তেল জাতীয় পদার্থের বর্জনের ফলে বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণের সুবিধাও হয়ে গেল। তেলজাতীয় পদার্থ মিশ্রিত শস্যদানার গুঁড়ো হাওয়ার সংস্পর্শে এলে বেশিদিন অবিকৃত থাকে না। একবিংশ শতাব্দীর উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী মানুষের খাদ্যতালিকার ৫০ থেকে ৮০ শতাংশই শস্যবীজের দখলে। প্রাতরাশের রুটি, পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, স্যান্ডউইচ থেকে গ্রামবাংলার পান্তাভাত; মধ্যাহ্নভোজের ভাত বা রুটি, বিকেলের জলখাবারের মুড়ি, বাদাম, চপ-কাটলেট, পিৎজা, পাস্তা আর রাতের খাবারের রুটি বা ভাত – এইগুলোই খাবারের প্রধান অংশ, সঙ্গের পদগুলো বৈচিত্র্যময় হলেও পরিমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাধান্য পায় না। ভাত বা রুটি আমাদের প্রধান খাবার; যদিও পৃথিবীর কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর খাবারের থালায় মাঝে মধ্যে প্রধান খাদ্য হিসেবে আলুর দেখা মেলে। তা সে চালই হোক বা গম, ঘাসজাতীয় শস্যদানার অবিকৃত গঠন একই রকম।

অবিকৃত শস্যদানার গঠন

এখন ধান থেকে চাল বানানোর মেশিনে ধানের বাইরের খোসা (ব্রান) আর মধ্যবর্তী অঙ্কুর বা বীজযুক্ত আবরণ (জার্ম) ছাড়িয়ে ভেতরের সাদা (এন্ডোস্পার্ম) অংশটি ব্যবহারের জন্য আলাদা করা হয়। চাল ও আটার ব্যবসায়ীরা প্রায় ২৫ ধরনের রাসায়নিকের সন্ধান জানেন, যার সাহায্যে একে আরও চকচকে, লোভনীয় ও সুস্বাদু বানানো যায়। ধানগাছের নিজের বংশবৃদ্ধির জৈবিক প্রয়োজনের অঙ্কুরটি হল মাঝের 'জার্ম' অংশটি। তাকে রক্ষা করার জন্য ও অঙ্কুরোদ্গমের সময় প্রয়োজনীয় ভিটামিন জোগায় বাইরের খোসাটি। ভেতরের সাদা যে অংশটি আমরা চাল হিসেবে বেছে নিই, সেটা মামুলি ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিগুণবর্জিত জটিল শর্করা। চালের তুষে বাইরের খোসা আর মাঝের প্রাক-অঙ্কুর (জার্ম) থাকে। ভবিষ্যতের শিশু উদ্ভিদটির বীজের (মূলত প্রোটিন) পুষ্টির প্রয়োজনীয় সঙ্কেতওয়ালা জিন এই মধ্যেকার আবরণে থাকে। বাইরের খোসায় প্রতিরক্ষার বর্ম হিসেবে থাকে ফাইবার, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ। মধ্যেকার এন্ডোস্পার্ম অংশ, যেটাকে আলাদা করে পরিশোধিত চাল অথবা সাদা আটা আর ময়দা হিসাবে খাবার জন্য ব্যবহার করা হয়, সেটা নিছক শর্করা। বীজ থেকে জন্মানোর পরে সদ্য-অঙ্কুরিত উদ্ভিদটির পাতা সৃষ্টির আগে পর্যন্ত (অর্থাৎ যখন নব-অঙ্কুরিত উদ্ভিদটি সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুতের জন্য অপরিণত) উদ্ভিদের শর্করার প্রয়োজন মেটায় ভেতরের এন্ডোস্পার্ম অংশটি।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট অপেক্ষাকৃত সস্তা, সেই সঙ্গে আসক্তি তৈরি করায় পটু। তাই সহজেই আমাদের খাবারে বড় অংশের অংশীদার হয়ে পড়ে। যত চকচকে সুদৃশ্য

লম্বা দানা, পালিশ করা পরিশোধিত চালের ভাত হবে, পেট ভরাতে তত বেশি করে খাওয়ার প্রয়োজন হবে। সেই ভাত তাড়াতাড়ি হজম হয়ে ফের খিদে পাবে। শর্করা জাতীয় খাবারে আসক্তি আমাদের অগোচরে ঘটে যায়। মিষ্টির দোকানের প্রতি আকর্ষণ প্রায় নেশার মতো গ্রাস করেছে, যদিও এটা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। ঘটনাচক্রে শর্করা জাতীয় খাবারের প্রতি এই আসক্তি সচেতন পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতিপত্তিবান নাগরিকদের চেয়ে আমাদের মতো গরিব দেশগুলোর (ধনী-দরিদ্র সবার) মধ্যে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। প্রসঙ্গত গত শতকের আশির দশকের হলিউডের জনপ্রিয় ছবি 'প্রিটি উওম্যান'-এর একটা দৃশ্যের কথা বলি। বিলাসবহুল হোটেলের পেন্টহাউসের প্রাতরাশের টেবিলে ধনী নায়ক গরিব নায়িকার সামনে সযত্নে সাজানো ফল, বেরি আর সসেজ-সালামি পূর্ণ দুটো থালা পেশ করলেন। প্রিয় নায়কের ভালোবাসা মেশানো সুষম প্রাতরাশের থালা ঠেলে ফেলে নায়িকা দূরে রাখা ঝুড়ি থেকে ময়দা-মাখন-মিষ্টির সংমিশ্রণে তৈরি মিষ্টি পাউরুটি তুলে নিল।

পালিশ-করা চালের ভাত

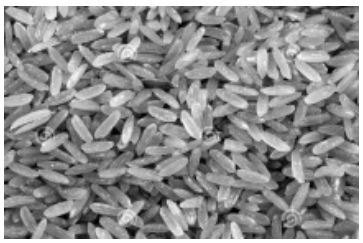

মোটা দানার লাল চাল

আমাদের মতো গরিব দেশে 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া আকাঁড়া' জাতীয় তর্কের অবকাশ আছে। সস্তার খাবার হিসাবে শর্করা প্রয়োজন। মুশকিল হয় এতে আসক্তি জন্মে গেলে। শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার জন্য খাদ্যে অন্যান্য মৌলিক খাদ্যাংশের মতো নির্দিষ্ট পরিমাণে শর্করাও প্রয়োজন। খিদে পেলে খাবারের বন্দোবস্ত তো করাই যায়। মনে রাখতে হবে, আগের কিস্তির খাবার কেবল পেট (পাকস্থলী) থেকে জায়গা খালি করে রক্তে মিশেছে। ফলেই খিদে পেয়েছে। আগের খাবারের যে অংশটি তখনও খরচ করা যায় নি, কেবল রক্তে ভেসে বেড়াচ্ছে, সেটা যাবে কোথায়? খাবারে শর্করার আধিক্যে প্রথমে অব্যবহৃত শর্করা সীমিত পরিমাণে যকৃতে গ্লাইকোজেন হিসাবে জমা হয়। যকৃতের ধারণক্ষমতা পূর্ণ হয়ে গেলে, অব্যবহৃত শর্করা চর্বি হিসাবে শরীরের অপ্রিয় জায়গাগুলোতে জমা হতে থাকে। তাই পেট ভরাতে হবে এমন খাবার দিয়ে, যা পেটে অনেকক্ষণ থাকবে, দেরিতে হজম হবে ও দেরিতে খিদে পাবে, ইতিমধ্যে চর্বি হিসেবে জমা হবার জন্য দাঁড়ানো গ্লুকোজের লাইন লম্বা করবে না।

পুনরাবৃত্তি দোষ এড়াতে শর্করার গ্লুকোজে পরিণত হবার হার (গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স) আর পরিমাণের (গ্লাইসেমিক লোড) বিস্তারিত আলোচনা এড়ালাম। আগের সংখ্যার 'চিনি যখন বিষ' প্রবন্ধে তা সবিস্তার পাওয়া যাবে। আমাদের খাবারের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ শর্করা জাতীয় খাবার থেকে বেছে নিতে হবে আর সেই শর্করা হবে তন্তু (ফাইবার), ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ জটিল শর্করা। আস্ত দানার শস্য সেই প্রয়োজন ভালোভাবেই মেটায়। যে কারণে চিনি দুষ্ট, সেই কারণেই সাদা, চকচকে, সরু, লম্বা সুগন্ধী পরিশোধিত চালও একই রকম ক্ষতিকারক। মূলত দুটো কারণে মেশিনে ছাঁটা চকচকে সাদা চালের ভাত, ময়দা আর বাজারে যে সব বেক-করা খাবার পাওয়া যায়, যেমন পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, কুকিজ, প্যাটিস, সিঙারা, নিমকি ইত্যাদি বর্জনীয়। প্রথমত, এসব খাদ্যের মূল উপাদান শস্যদানার বাইরের আবরণের ফাইবার (তন্তু) ও ঠিক তার নীচের অংশের (বীজ বা জার্ম) ভিটামিন ফেলে দেওয়া হয়েছে, পড়ে রয়েছে কেবল শর্করা (এমটি ক্যালরি)। দ্বিতীয়ত, খাবারে যত পরিশোধিত শর্করা থাকবে, সেটা তত তাড়াতাড়ি হজম হবে অর্থাৎ গ্লুকোজে পরিণত হবে, রক্তে চিনির মাত্রা তত তাড়াতাড়ি বাড়বে (হায়ার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স) আর তন্তুবিহীন হওয়ার জন্য শরীরে বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ জমতে থাকবে (হায়ার গ্লাইসেমিক লোড)। অব্যবহৃত গ্লুকোজ চর্বিতে পরিণত হতে থাকে পরে দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকার সময়ে শক্তি জোগানোর জন্য। কিন্তু আমাদের লাগাতার খেয়ে যাওয়ার ঠেলায় সেই দীর্ঘ সময় অভুক্ত থাকার অবস্থা তৈরি হওয়ার অবকাশই পায় না।

এক বা দুই পুরুষ আগেও খাবারের থালায় ঢেঁকিছাঁটা চাল থাকত, প্রাতরাশে চিঁড়ে, মুড়ি থাকত। বরিশালের বালাম চালের কথা শুনেছেন? লালচে, ঢেঁকিছাঁটা বালাম চালের খ্যাতি আছে। ঘরোয়া ও প্রতিবেশী দেশের সেই

খাদ্যসংস্কৃতিকে অবহেলা করে দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বেছে বেছে পশ্চিমী ক্ষতিকারক খাবারগুলোই গ্রহণ করছি। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বিস্কুট, পাউরুটি ও অজস্র বেক করা খাবার, চটজলদি খাবার (ফাস্ট ফুড), মেশিনে ছাঁটা সুদর্শন সুঘ্রাণযুক্ত চালের ভাত আমাদের খাবারের মুখ্য অংশ। ইদানীং যে উচ্চরক্তচাপ, মধুমেহ বা হৃদরোগের বাড়বাড়ন্তের কথা শোনা যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ বিকৃত খাদ্যাভ্যাস। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে বিদেশে যন্ত্রচালিত ধান ও গমভাঙা কলের আবিষ্কার হয়েছিল। বিংশ শতকের শেষভাগে সেই প্রযুক্তি আমাদের গ্রাস করে খাদ্যাভ্যাস পাল্টে দিয়েছে। বংশপরম্পরায় রোগসৃষ্টিকারী জিনের পরিবর্তন করে আমাদের হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের মতো মারণ রোগের উপযোগী করে তুলেছে। আরও কারণ আছে, খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেটে যা ঢোকাচ্ছি, তাই দিয়েই তৈরি হচ্ছে পার্থিব এই শরীর। কখনও কখনও পরিশোধিত শস্যদানা বা তার থেকে প্রস্তুত খাদ্যবস্তুতে অতিরিক্ত ভিটামিনের অন্তর্ভুক্তির (এনরিচ্‌ড, ফর্টিফায়েড) কথা বলা হয়ে থাকে। সেটা পরিমাণে প্রাকৃতিক পরিমাণের চেয়ে কম ও অত্যন্ত নিম্নমানের। এখন বাজার ব্রাউন পাউরুটিতে ছেয়ে গেছে, তার মধ্যে অধিকাংশই কেবল রঙ করা সাদা পাউরুটি মাত্র।

কল বের করা ছোলা

তা হলে উপায় ?

গম জাতীয় শস্যদানা থেকে প্রস্তুত আটার ক্ষেত্রে পূর্ণদানা থেকে প্রস্তুত খাবার, রুটি ইত্যাদি ব্যবহারে অসুবিধা নেই। কেবল বাদামি রং দেখে পূর্ণদানার পাউরুটি চেনা যাবে না, প্যাকেটের ওপরে 'হোল গ্রেন' লেখা আছে কিনা দেখে নিতে হবে। কৃত্রিম উপায়ে পালিশ করা নয়, মোটা দানার লালচে চালের ভাত ব্যবহারই শ্রেয়। পেট ভরানোর জন্য এই চালের ভাত পরিমাণে কম লাগে, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। সুস্বাদু, সুদর্শন আর সুগন্ধিত নয়— এই অজুহাতের পাশাপাশি পূর্ণদানার শস্য থেকে তৈরি খাবার বেশি চিবোতে হয় বলেও অনেকের ঘোর অপছন্দ। মনে রাখতে হবে, এটাই এই জাতীয় খাবারের গুণ। বেশি চিবোনোর জন্য খেতে সময় বেশি লাগলে আমাদের পরিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ঠিকভাবে কাজ করতে পারে। ওজন বশে রাখায় বেশ কাজ দেয়। তন্তুসমৃদ্ধ আস্তদানার গমের আটা ও মোটা লালচে চালের ভাত অনেকক্ষণ পাকস্থলীতে থেকে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় বহুক্ষণ ধরে শক্তি জোগায়, কৃত্রিমভাবে তাড়াতাড়ি খিদে পেয়ে যায় না। সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা এবং ডাল (সবুজ খোসাওয়ালা মুগ, বিনস) জাতীয় খাবার থাকলে ভালো হয়। পরিভাষায় একে লেগিউম বলে। এতে যথেষ্ট তন্তু ও প্রোটিন থাকে। পূর্ণদানার শস্যবীজকে আমরা ভাল শর্করা বলব। ভাল শর্করায় অতিরিক্ত গুণ হিসাবে পাওয়া যাবে রোগপ্রতিরোধী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, 'ই' ও 'বি' শ্রেণীর ভিটামিন ও স্বাস্থ্যকর বহুশৃঙ্খলের অসম্পৃক্ত স্নেহজাতীয় খাদ্যাংশ (পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড)।

পরিশোধিত শস্যদানা থেকে প্রস্তুত খাবারে তন্তু ও ভিটামিনবিহীন শর্করা থাকে, যা শরীরে চিনির মতো কাজ করে, রক্তে সুগারের ও ট্রাইগ্লিসারাইডের (এক ধরনের রক্তে প্রবাহমান স্নেহজাতীয় পদার্থ) মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, পেটে চর্বি জমতে থাকে, মধুমেহ রোগের সম্ভাবনা বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য, বৃহদান্ত্রের ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়, ওজন বেড়ে যাবার জন্য হাঁটু ও অন্যান্য অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ বা অতিমাত্রায় প্রকট ধরনের নিরাময়-অযোগ্য বাতের রোগ (অস্টিও আর্থ্রাইটিস) সৃষ্টি করে। বিশিষ্ট হৃদরোগবিশেষজ্ঞ উইলিয়াম ডেভিসের মতে, পরিশোধিত শস্যদানা একটি নিখুঁত মধুমাখা বিষ— গ্রহণের সময় নেশা ধরায়, আর তিলে তিলে নিশ্চিতভাবে হৃদরোগ আর মধুমেহর মতো অনিরাময়যোগ্য রোগের দিকে ঠেলে দেয়। অঙ্ক কষে দেখা গেছে, দু স্লাইস ময়দার সাদা পাউরুটি, ছ চামচ চিনি আর একটা চকোলেটের বার রক্তে সুগারের মাত্রা বেশি পরিমাণে বাড়ানোর ক্ষমতা ধরে।

আমাদের প্রপিতামহগণ হলদে সোনালী গমের আটা আর লাল মোটাদানার ভাতে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করে স্বাস্থ্যখাতে নিয়ন্ত্রিত খরচে বেশ বেঁচেবর্তে ছিলেন। বিগত ৫০ বছরে জিনের ওপর খোদকারী করে উচ্চফলনশীল খর্বাকৃতি শস্যের বিপ্লবের মাধ্যমে স্বল্পসময়ে অনেক বেশি করে শস্যদানা উৎপাদন করে শস্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছি। অদূর ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা এড়ানো গিয়েছে। অধিক ফলনশীল শস্যের স্বাস্থ্যের ওপর নিরাপত্তা নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা করা হয় নি। নতুন ধরনের এই গমে পরিবর্তিত

ধরনের 'গ্লায়াডিন' নামে এক ধরনের প্রোটিন থাকে, যেটা গমজাতীয় খাবারের 'গ্লুটেন'-এর সমগোত্রীয়। গ্লুটেন এন্টেরোপ্যাথি নামে এক ধরনের আন্ত্রিক রোগ ছাড়াও গ্লায়াডিন আমাদের মস্তিষ্কে আফিং (মরফিন) জাতীয় রাসায়নিকে রূপান্তরিত হয়ে 'ভালো লাগা' (ফিল গুড এফেক্ট) ধরনের নেশা ধরায় ও খিদে বাড়ায়। দেখা গেছে, পরিশোধিত সাদা আটা ও ময়দার খাবার দিয়ে পেট ভরাতে হলে দৈনিক প্রায় ৪০০ কিলোক্যালোরি বেশি খাওয়া হয়ে যায়। ২০০৪ সালের এক গবেষণায় (লুটভিগ ২০০৪ ল্যানসেট), লাল আটার চেয়ে সাদা আটায় ইঁদুরদের পেটে ৭১ শতাংশ বেশি চর্বি জমে।

দীর্ঘমেয়াদিভাবে সাদা শস্যদানা খাওয়ার জন্য খাবার অব্যবহিত পরে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা উচ্চমাত্রায় পৌঁছে যায়। এ অবস্থায় রক্তের বিশেষ কিছু প্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় (গ্লাইকেশন) 'অ্যাডভান্সড গ্লাইকেসন প্রোডাক্টস (এজিপি)' তৈরি হয়ে যায়। এটা আবার বিভিন্ন অঙ্গে প্রদাহের (ইনফ্ল্যামেশন) কারণ। এখন যে বিভিন্ন হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোক, বিশেষ করে রক্তনালীর প্রদাহর রমরমা দেখা যায়, তার অন্যতম কারণও এই অ্যাডভান্সড গ্লাইকেসন প্রোডাক্টস। উচ্চমাত্রার গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অধিক মাত্রায় ইনসুলিনের ডাক পড়ে। দীর্ঘসময় অতিমাত্রায় ইনসুলিনের প্রভাবে শরীরের কোষসমূহে ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা কমতে থাকে (ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স)। এর অবধারিত ফল হিসাবে পেটে এক বিশেষ ধরনের ক্ষতিকারক সক্রিয় চর্বি জমতে শুরু করে। ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ হল এর অন্তিম পরিণতি।

শস্যদানার পাউরুটি

আমাদের খাবারের মুখ্যভাগ হিসাবে অপরিশোধিত শস্যদানার ফাইবার বা তন্তু রক্তে চিনির মাত্রা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে উপকার করা ছাড়াও মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। ঝাড়ুদারের ভূমিকা পালন করার মতো পৌষ্টিকতন্ত্রের রোগজীবাণু ও অন্যান্য ময়লা সাফ করে। বৃহদান্ত্রের ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমায়। অন্ত্র থেকে রক্তে কোলেস্টেরলের মিশ্রণ কমায়। অন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগের প্রকোপ হ্রাস করে। শস্যদানা সমৃদ্ধ খাবার রক্তে অম্লতা বাড়িয়ে দেয়, যেটা নিয়ন্ত্রণের জন্য হাড়ের থেকে ক্যালসিয়ামের ডাক পড়ে। হাড়ের ক্যালসিয়াম কমে গিয়ে তার ভেঙে যাবার প্রবণতা বাড়ায়।

শস্যদানার নির্বাচনের সময় তার সঙ্গে অঙ্কুরিত ডাল ও ছোলাজাতীয় খাবার (স্প্রাউট, লেগিউম) অন্তর্ভুক্ত করলে বিশেষ লাভ হবে। এতে প্রয়োজনীয় ফাইবারের সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা প্রোটিন ও ভিটামিন পাওয়া যাবে। প্রাকৃতিক ভিটামিন কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিনের চেয়ে বেশি কাজে আসে। অঙ্কুরিত শস্যদানার শর্করা খাবারের থালাতেই মলটোজে পরিণত হয়ে হজমের প্রথম ধাপ পেরিয়ে যায়। বদহজমের সম্ভাবনা নির্মূল করে। শস্যদানার সঙ্গে কাঁচা বাদাম জাতীয় জিনিস মিশিয়ে খাবার প্রস্তুত করলে বিশেষ উপকার হয়। এতে রক্তে চিনির মাত্রা কমে ও উপকারী অসম্পৃক্ত ফ্যাট পাওয়া যায়, যেটা রক্তের ক্ষতিকারক লঘু ঘনত্বের কোলেস্টেরল কমায়।

খাবারে শস্যদানা মুখ্য অংশ অধিকার করে থাকলেও এর প্রয়োজনীয়তা সব বৈজ্ঞানিক স্বীকার করেন না। কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের আগে আদিম মানুষ শস্যদানা ছাড়াই জীবনধারণ করত। শস্যদানার এই বিকৃত রূপে অভ্যস্ত হবার পিছনে ব্যবসায়িক ষড়যন্ত্র আছে। পরিশোধিত শস্যদানায় জার্মের অংশ না থাকার জন্য গুদামে ও দোকানের আলমারিতে বহুদিন ভাল থাকে। ঘটনা হল, আমরা শস্যদানা ছাড়াই বেশ সুস্থ থাকতে পারি। সেটা বড় বিপ্লব। যতক্ষণ না সম্ভব হচ্ছে, শস্যদানার পরিমাণ কমানো ও তার গুণমান পরিবর্তন করা জরুরি। রান্নাঘরে এই বিপ্লব করতে পারলে শরীর আমাদের প্রচেষ্টাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। 'আমার সন্তান যেন চিরকাল থাকে দুধে ভাতে' জাতীয় উদ্ধৃতি সাহিত্যের পাতাতে থাকাই ভাল। বাস্তবে কোনো মা যেন এই বাক্যে বিশ্বাস না করেন।

একনজরে পূর্ণদানার শস্যবীজের উপকারিতা— ১) ৩০ শতাংশ সেরিব্রাল স্ট্রোকের সম্ভাবনা কম, ২) ২৫ শতাংশ ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা কম, ৩) ৩০ শতাংশ হৃদরোগের সম্ভাবনা কম, ৪) স্থূলতা হ্রাস, ৫) হাঁপানির প্রকোপ কম, ৬) বিভিন্ন প্রদাহজনিত (ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ) রোগের বোঝা কম, ৭) রক্তচাপ বশে রাখা সম্ভব, ৮) কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে চিরতরে মুক্তি, ৯) বৃহদান্ত্রের ক্যান্সারের সম্ভাবনা কম, ১০) সুস্থসবল দাঁত ও মাড়ি।

যে কারণে পরিশোধিত শস্যদানা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে— ১) তন্তু বা ফাইবার ও ভিটামিন বর্জন, ২) সাদা আটা ও ময়দায় ক্ষতিকারক গ্লুটেন ও গালায়াডিনের উপস্থিতি, ৩) সুদৃশ্য ও সুগন্ধযুক্ত করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিকের ও ব্লিচিং পদার্থের ব্যবহার, ৪) উচ্চ গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ও উচ্চ গ্লাইসেমিক লোডের বৈশিষ্ট্যের জন্য খাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ও উচ্চমাত্রায় রক্তে চিনির মাত্রা বৃদ্ধি। ফলে প্রথমে ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি ও পরে ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা হ্রাস।

পরিশোধিত শস্যদানার বিকল্প — ১) পূর্ণদানার গমের আটা, প্রকৃত বহু ধরনের শস্যদানা (মাল্টি গ্রেইন) থেকে প্রস্তুত (মাখন বা ভোজ্যতেল বিহীন), ২) বাদামি পাউরুটি (রং করা বাজার ছেয়ে যাওয়া ব্রাউন ব্রেড নয়), ৩) অপেক্ষাকৃত মোটাদানা ও লালচে কৃত্রিম উপায়ে পালিশ না করা চালের ভাত, ৪) চিঁড়ে, মোটা চালের মুড়ি, ৫) অঙ্কুরিত ছোলা ও খোসাসহ ডাল, ৬) ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার, ওট।

পূর্ণদানা ও সংবর্ধিত শস্যদানার গুণাগুণের বিচার
(Nutritional effects of refining or enriching wheat and rice)

পূর্ণদানা পরিমাণের নিরিখে অর্থাৎ পূর্ণদানার পরিমাণকে ১০০ শতাংশ ধরে	**আটা ও ময়দা**			**চাল**		
	পূর্ণদানা Whole	পরিশোধিত Refined	সংবর্ধিত Enriched	পূর্ণদানা Whole	পরিশোধিত Refined	সংবর্ধিত Enriched
			(সব অঙ্ক শতাংশে)			
মোট শক্তি (ক্যালোরি)	১০০	১০৭	১০৭	১০০	৯৯	৯৯
শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)	১০০	১০৫	১০৫	১০০	১০৪	১০৪
তন্তু (ফাইবার)	১০০	২২	২২	১০০	৩৭	৩৭
প্রোটিন	১০০	৭৫	৭৫	১০০	৯০	৯০
ভিটামিন বি-১ (থায়ামিন বি-১)	১০০	২৭	১৭৬	১০০	১৭	১৪৪
রাইবোফ্লাভিন (বি-২)	১০০	১৯	২৩০	১০০	৫৩	৫৩
নিয়াসিন (বি-৩)	১০০	২০	৯৩	১০০	৩১	৮২
প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি-৫)	১০০	৪৩	৪৩	১০০	৬৮	৬৮
পাইরিডক্সিন (বি-৬)	১০০	১৩	১৩	১০০	৩২	৩২
ফোলেট (বি-৯)	১০০	৫৯	৩৫০	১০০	৪০	১১৫৫
ভিটামিন ই	১০০	৫	৫	১০০	১৮	১৮
ক্যালসিয়াম	১০০	৪৪	৪৪	১০০	১০০	১০০
আয়রন	১০০	৩০	১২০	১০০	৫৪	২৯৩
ম্যাগনেসিয়াম	১০০	১৬	১৬	১০০	১৭	১৭
ফসফরাস	১০০	৩১	৩১	১০০	৩৫	৩৫
পটাশিয়াম	১০০	২৬	২৬	১০০	৫২	৫২
সোডিয়াম	১০০	৪০	৪০	১০০	৭১	৭১
জিঙ্ক	১০০	২৪	২৪	১০০	২৯	২৯
কপার	১০০	৩৮	৩৮	১০০	৭৯	৭৯
ম্যাগনেশিয়াম	১০০	১৮	১৮	১০০	২৯	২৯
সেলেনিয়াম	১০০	৪৮	৪৮	১০০	৬৫	৬৫

সনাতন বিশ্বাস- ২

জয়দেব গুপ্ত

চার্বাক দর্শন

বহুদিন সনাতনের পাত্তা নেই। প্রায় মাসাধিক কাল পরে একদিন দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিরে সনাতন, কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিলি? বলেছিলি, নতুন গল্প শোনাবি– সে কৈ?'

সনাতন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'নতুন কাহিনী শুনবি? তবে বলে রাখি, এগুলো কোনো গল্প বা কাহিনী নয়, সত্য ঘটনা।' এই বলে সনাতন বলতে আরম্ভ করল–

সনাতন উবাচ

সুগায়ক ও কবি সুদত্তকে রাজসৈন্য বন্দী করেছে। সুদত্ত সামগান বা বেদপাঠ করত না। সে নিজেই গান বাঁধত আর সুর দিয়ে তা গাইত। এবং এই গানের জন্যই সুদত্ত রাজবন্দী হল। রাজরক্ষীরা সুদত্তকে বন্দী করে নিয়ে যাবার সময়েও সে ঐ গান গাইছিল। সুদত্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ– রাজদ্রোহ; মানুষকে ভুল বোঝানো; বেদ ও ব্রহ্মবাদকে অস্বীকার করা; জড়বাদের প্রচার; ঈশ্বরকে অস্বীকার; দেবীমূর্তির প্রতি বিরূপ মন্তব্য। এবং এই কারণে সুদত্ত বর্তমানে রাজ-বন্দীশালায় বন্দী।

তবে এখানে পূর্বকথা একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই ঘটনা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর। তখন কোশলে রাজা প্রসেনজিৎ ও বিদুদভের রাজত্বকাল শেষ হয়ে গেছে। মগধে অজাতশত্রুর কালও পেরিয়ে এসেছে। মগধে এখন রাজা শিশুনাগের রাজত্বকাল চলছে। কোশল রাজ্যেরও সে প্রতাপ আর নেই।

কোশলে প্রসেনজিৎ ও বিদুদভের রাজত্বকালে সীমান্তবর্তী এলাকায় অনেক সামন্ত রাজা ছিল; এবং সেই সামন্ত রাজারা সবাই ক্ষত্রিয় ছিল না। ব্রাহ্মণ সামন্তরাজা ও বৈশ্য সামন্তরাজারাও কোশল রাজকোষে খাজনার বিনিময়ে নিজ নিজ রাজ্যে শাসন চালাত। যেহেতু এই সময় ধনী ব্যবসায়ী বৈশ্যরা অর্থবলে বলীয়ান হয়ে উঠল; সুতরাং তারাও সামন্তরাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল। যদিও পরবর্তীকালে এই সামন্তরাজারা কোশলরাজকে নামমাত্র খাজনা দিত অথবা কিছুই দিত না; তথাপি এদের নামের সঙ্গে সামন্ত কথাটা জুড়ে গিয়েছিল।

তবে, যে কাহিনী শুরুতেই বলেছি, সেই সুদত্ত ছিল এক ব্রাহ্মণ সামন্তর অধীনে এক রাজ্যের অধিবাসী। এই ব্রাহ্মণ সামন্তরাজা উদয়নের নির্দেশেই সুদত্তকে বন্দী করা হয়েছে। উদয়ন কট্টরভাবে ব্রহ্মবাদে বিশ্বাসী এবং যেহেতু চার্বাক দর্শনের জড়বাদ ব্রহ্মবাদের বিরোধী, রাজা উদয়ন কখনই জড়বাদী চার্বাক দর্শনকে সহ্য করতে পারেন না। এবং সুদত্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নাকি যে কবিতা বা গান বাঁধত, তাতে জড়বাদী চার্বাক দর্শনের প্রচার হত।

জড়বাদী চার্বাক দর্শন যদি প্রচার হয় এবং দেশের প্রজারা যদি তা বিশ্বাস করতে শুরু করে, তবে ব্রহ্মবাদী জ্ঞানের সাড়ে সর্বনাশ; আর ব্রহ্মবাদের সর্বনাশ মানে ধর্মের নেশায় মানুষকে আচ্ছন্ন রাখার প্রক্রিয়াটাই বাতিল হবে; এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা ধনে-প্রাণে মারা যাবে। রাজত্ব কায়েম রাখার জন্য বর্ণাশ্রম ও ব্রহ্মবাদ ভীষণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সুদত্ত দেবী জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর পূজাকালে, মূর্তিপূজা ও দেবদেবী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছে। মূর্তিপূজাকে অনার্য, অসভ্য রীতি বলে চিহ্নিত করেছে এবং মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে গান বেঁধেছে। সুতরাং, সুদত্ত এখন কারান্তরালে।

পূষন ও কারক উদয়নের রাজরক্ষীদলের সৈন্য। দুজনে একই সঙ্গে প্রহরা দেয়; চোরডাকাত ধরে আনে, পেটায়। দুজনে একই সঙ্গে নাগরী গৃহে গমন করে। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে একটা প্রগাঢ় সখ্য গড়ে উঠেছে। সেদিন সন্ধ্যায় দুই বন্ধু একত্রে আসব পান করছিল। সুদত্তকে ধরে আনার সময় পূষন প্রচুর উদ্যোগ নিয়েছিল। তাই রক্ষীপ্রধান পূষনকে একপাত্র দ্রাক্ষাসুরা উপহার দিয়েছেন। পূষন ও কারক সেই দ্রাক্ষাসুরার সদ্ব্যবহারে ব্যাপৃত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় আর প্রহরার কাজ নেই, তাই দুই বন্ধু গল্পগাছা সহ দ্রাক্ষাসুরার স্বাদগ্রহণ করছে। (প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, সুদত্তকে বন্দী করার সময় যদিও পূষণ রক্ষীদলে ছিল, কিন্তু কারক অন্যত্র অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায়, বন্দী আনয়নের

কাজে যায় নি।)

পূষণ বলল, 'সখা, আমাদের ভাগ্যে তো তন্ডুল সুরা, অথবা দিন ভাল থাকলে, খর্জুর সুরাই জোটে। দ্রাক্ষারস সুরার কিন্তু স্বাদই আলাদা। তাছাড়া যে আমেজটা হয়, তা যেন চন্দ্রালোকে মেঘে ভেসে থাকার মতো অনুভূতি।'

কারক বলল, যা বলেছিস। জানিস, আমি একবার কৃষ্ণ দ্রাক্ষার সুরা পান করেছিলাম, সেও অমৃতবৎ। তা তোকে হঠাৎ রক্ষীপ্রধান দ্রাক্ষাসুরা দান করল কেন?

— কারণ অতি সামান্য। যদি রাজদরবারে ডাক পড়ে, আমাকে বলতে হবে, রক্ষীপ্রধানের পরিকল্পনাকে অনুসরণ করেই আমি সুদত্তকে বন্দী করতে সমর্থ হয়েছি। না হলে হয়ত তাকে ধরাই যেত না!

— সত্যিই তা?

— কচু। একজন কবি-গায়ককে ধরার মধ্যে কি বাহাদুরি আছে! কবি আপন গৃহে বসে আহার করছিল। আমরা দশজন রক্ষী মিলে তাঁকে বন্দী করলাম, কোনো বাধা ছাড়াই।

— এতে বাহাদুরি কোথায়?

— সে কি আর রাজা জানে? রক্ষীপ্রধান হয়ত রাজার কাছে অনেক কিছু বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। কত কষ্ট করে সুদত্তকে ধরা হয়েছে— তার একটা কাল্পনিক বর্ণনা হয়ত দিয়েছে। এবং অবশেষে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী যে অসম্ভবকে সম্ভব করা গেছে, সেটাও ফলাও করে রাজার কানে তুলেছে। এবং প্রয়োজনে যাতে সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্যেই আমাকে এই দ্রাক্ষাসুরা দান।

– তা এই গায়ক-কবি সুদত্তকে ধরা হল কেন?

– কারণ সুদত্ত অজিত কেশকম্বলী প্রচারিত জড়বাদকে গানের মাধ্যমে প্রচার করছিল।

– সুদত্তের গান আমি শুনেছি। সহজ সরল ভাষায় মানুষের দৈনন্দিন দিন কাটানোর গান, সহজ ভাবনাচিন্তার গান, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায়, এমন সব কথা দিয়ে গান।

-- তাই দিয়েই তো এই জড়বাদীরা নিজেদের ভাবনাচিন্তাগুলো প্রকাশ করে। তুই কি জানিস, আমাদের সনাতন ধর্ম মতে মানুষের শরীর সৃষ্টি পাঁচটা জিনিস দিয়ে— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম— অর্থাৎ, পৃথিবী (মাটি), জল, তেজ (শক্তি), বাতাস ও আকাশ। অথচ, অজিতের জড়বাদ প্রচার করল, মানুষের শরীর গঠিত জল, বাতাস, মাটি ও শক্তি দিয়ে। আকাশকে ওরা বাদ দিয়েছিল। আকাশ মানে দেবতাদের আশীর্বাদ। অজিত দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। তাই আকাশের কোনো অংশ নেই।

– ঠিকই তো, আমারও তো তাই মনে হয়। আকাশ আবার কীভাবে আমাদের শরীর গঠন করল?

– সে আমি জানি না বন্ধু। কিন্তু সনাতন বিশ্বাসকে অবহেলা তো করা হল।

– কোনো বিশ্বাস যদি ভুল হয়, তাকে অস্বীকার করতে আপত্তি কোথায়!

– কে জানে! আমি অত বুঝি না। তবে সুদত্ত নাকি আরও প্রচার করত যে, ব্রহ্মবাদীদের শেখানো আত্মা, পুনর্জন্ম, জন্মান্তরের পাপপুণ্য, এসব মিথ্যে কথা। মানুষ একবারই জন্ম নেয়, একবারই মরে। এমনকি, অজিতের শেখানো মতানুযায়ী সুদত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করত এবং সেই নিয়ে গান বাঁধত।

— দেখ পূষন, যে যার মত প্রকাশ করতেই পারে। কোনটা সঠিক, কোনটা বেঠিক, মানুষ বেছে নেবে। এতে রাজরোষের কী হল?

– তাই বলে আত্মা, পুনর্জন্ম— এগুলোকে অস্বীকার!

– আত্মা, পুনর্জন্ম আছে, এমন কোনো প্রমাণ কি আছে তোর কাছে? আসলে এগুলো একরকম বিশ্বাস। পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস। কিন্তু কেউ যদি এগুলো বিশ্বাস না করে, তাতে অপরাধটা কী?

-- শুনেছি, এই বিশ্বাসগুলোই রাজতন্ত্রকে, ব্রাহ্মণ্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখে। যদি পুনর্জন্ম বা আত্মায় বিশ্বাস না থাকে, তাহলে একজন রাজা, একজন ব্রাহ্মণ, একজন শূদ্র আর একজন দাস হল কেন? এই বিশ্বাস না থাকলে তো সব মানুষই সমান হয়ে যাবে। বর্ণাশ্রম উঠে যাবে, দাসপ্রথা উঠে যাবে। রাজ্য চলবে কেমন করে!

– এই তো তুই আসল কথাটা বলি দিয়েছিস। এই বিশ্বাসগুলো মানুষের মধ্যে থাকা প্রয়োজন রাজতন্ত্রের জন্য, ক্ষমতা, বৈভব, ভোগ, উপভোগের জন্য।

– সেটাও ঠিক মনে হচ্ছে। তুই ঠিক বলেছিস। কিন্তু এটাই তো হয়ে আসছে বহু বছর ধরে। পাল্টানো যাবে না তো।

– পাল্টানো যাবে কি যাবে না, সেটা পরের কথা। কিন্তু মানুষ ভাববে অথবা মানুষকে সঠিক চিন্তায় ভাবাতে হবে।

-- তা তুইও কি বিশ্বাস করিস, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই?

-- ঈশ্বরের সংজ্ঞা কী আমি জানি না। তবে একটা কথা তোকে বলে রাখি, এটা যেন প্রকাশ না হয়। সুদত্তকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। সুদত্তর গানও আমার ভাল লাগে। সুদত্তর সঙ্গে চার্বাক মতবাদ নিয়ে আমার প্রচুর আলোচনা হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, অজিতের ব্যাখ্যায় কিছু সত্য আছে। তবে আবার বলি, তুই যেন এ সব কথা কাউকে বলিস না।

— পাগল নাকি! এটা তোর-আমার মধ্যে কথা।

— সুদত্তর কাছ থেকে আমি জেনেছি, অজিত বলতেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুভূতি, উপলব্ধি এবং যুক্তির দ্বারা যা বোঝা যায়, তাই সত্যি, বাকি সব মিথ্যে। অজিত শুধুমাত্র বিশ্বাসকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেন নি। অজিত এও বলতেন যে, পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত দ্বারা সত্যকে বিচার করতে হবে, বিশ্বাসের আবেগ দিয়ে নয়। ঈশ্বর, আত্মা, পরজন্ম, প্রামাণ্য নয়, তাই মিথ্যে বিশ্বাস মাত্র।

— বাবা, তুই তো অনেক কিছুই জানিস।

— হ্যাঁ রে পূষন, সুদত্তর প্রাণদণ্ড হবে?

— জানি না। তবে সুদত্ত তো মূর্তিপূজাকেও অপমান করেছে। সেই যে গানটা গাইত—

অনার্যরা এনে দিলেন দ্যাবা দেবীর দল।
আর্যরা তা গ্রহণ করে হলেন মাকাল ফল।।

কারক বলল, এটাও তো সত্যি কথা। আর্যরা যাগযজ্ঞ করত, ইন্দ্র, অরুণ, বরুণ, অগ্নির প্রতি যজ্ঞ-আহুতি দিত। কিন্তু ঈশ্বর ছিলেন একাত্মা, পরমাত্মা— একজন রূপহীন, আকারহীন।

কিন্তু তাতেও স্বস্তি নেই। অনার্য সভ্যতা থেকে দেবদেবীর আগমন ঘটল। মূর্তিপূজার চল হল। অনার্যরা লিঙ্গপূজা করত বলে আর্যরা কত ব্যঙ্গ করত। কিন্তু এখন তো তারাই শিবপূজা, শিবলিঙ্গ পূজা আরম্ভ করেছে। মানুষের বিশ্বাসটাকেও জগাখিচুড়ি করে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। মানুষও দেবতার রূপ দেখতে পেয়ে ভক্তিতে বিগলিত হচ্ছে। অথচ কেউ বুঝতে পারছে না, পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস, মূর্তিপূজার বিরোধী। মানুষ এখন নিরাকার ব্রহ্ম এবং সাকার দেবতাদের মিশ্রণে ঘোল খাচ্ছে। কেউ জানে না কোনটা ঠিক। অতএব সব কিছুই বিশ্বাস করো।

আর জড়বাদীরা বলে, সবটাই ফক্কা। পরমাত্মাও নেই, সাকার দেবদেবীও নেই। চোখ থেকে অন্ধ বিশ্বাসের ঠুলিটা খোলো, সব বুঝতে পারবে।

(সনাতন উবাচ সমাপ্ত)

আমি এতক্ষণ সনাতনের কথা শুনছিলাম। বললাম, তারপর?

সনাতন বলল, 'তারপর আবার কী? এখনও এই একবিংশ শতকেও মানুষ চোখে ঠুলি এঁটে রয়েছে। অন্ধত্ব ঘোচে নি।'

আমি চুপ করেই ছিলাম। সনাতন বলে চলল, 'চার্বাক দর্শনে বলেছে, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত– বোঝার জন্য এই দুটো প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুভব, উপলব্ধি এবং যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত এটুকুই সত্য; বাকি সব মিথ্যে।' আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছিস কি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু সুদত্তর কী হল? প্রাণদণ্ড?'

সনাতন বলল, 'সুদত্তকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেউ বলে, বন্দীশালা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কেউ বলে, সুদত্তকে নিভৃতে খুন করে শবদেহ গায়েব করে দেওয়া হয়েছিল। যেটা খুশি বিশ্বাস কর।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মারক বক্তৃতা

বিষয়: **অসংগঠিত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই**

বক্তা: **বোলান গঙ্গোপাধ্যায়**

স্থান: জীবনানন্দ সভাঘর।

২২ নভেম্বর ২০১৪

শনিবার বিকেল পাঁচটায়

চাকমা জাতির কুসংস্কার

দেবপ্রিয় চাকমা

চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের এক জনজাতি। উপেক্ষা অবহেলায় জীবন কাটানো এই মানুষগুলোর নানা সংস্কার ও কুসংস্কার নিয়ে এই প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে একটা জিনিস স্পষ্ট, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু কুসংস্কার তাঁরা বর্জন করেছেন, করে চলেছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা, যাঁরা শিক্ষিত, সভ্য, আধুনিক ইত্যাদি বিশেষণে সাজতে ভালবাসি, তাঁরা কিন্তু নানা কুসংস্কারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ছি। তা থেকে কোন শিক্ষায় মুক্তি পাব কে জানে!

চাকমা রাজ্য তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম (Chittagong Hill Tracts) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। আয়তনে বাংলাদেশের এক-দশমাংশ। ভৌগোলিক স্থানাঙ্কের নিরিখে ২১.১০° ও ২৩.৪° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১.৪০° ও ৯২.৪২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ১৫৫০ সালে পর্তুগিজ পর্যটক Jao De Barros চাকমা রাজ্যের যে সীমানা দেখিয়েছিলেন, তা ছিল এইরকম— উত্তরে ফেনি নদী, দক্ষিণে নাফ নদী, পূর্বে লুসাই পাহাড় আর পশ্চিমে সমুদ্র। ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিযুক্ত চট্টগ্রাম কাউন্সেলের প্রধান কর্মকর্তা Henry Verelst সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকার করেন– The local jurisdiction of Chakma Raja Shermust Khan is to be all the hills from Pheni river to the Sangu and from Nizampur road to the hills of Kuki Raja. ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে চাকমা রাজাদের কোনো কালেই তেমন বনিবনা ছিল না। বেশ কয়েকবার যুদ্ধ বাধে। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, ইংরেজ শাসকগণ অস্ত্রের জোরে চাকমাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় নি। সুনীতিভূষণ কানুনগো লিখেছেন, Dewan Ranu Khan never submitted to the British authorities and continued the resistance fight till the end of his life. Buchanan Hamilton refers to his last engagement with the British troops in

1795-96. সত্য ঘটনা হল, ২৫ জুন ১৮৬০ সাল পর্যন্ত চাকমা রাজ্য স্বাধীন ছিল। ২৬ জুন ১৮৬০ সালে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজেদের দখলদারি শুরু করে। বারবার হেরে গিয়ে ১৮৭০ সালে চাকমা রাজার ক্ষমতা ও অহঙ্কারকে খর্ব করতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার চাকমা রাজ্যের উত্তর অংশকে নিয়ে মং সার্কেল এবং মধ্য ও দক্ষিণ অংশকে নিয়ে চাকমা সার্কেল গঠন করে। চাকমা রানী কালিন্দি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানান। কিন্তু সেই আপিল নাকচ করে দেওয়া হয়। ১৮৮১ সালে বঙ্গীয় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করেন।

দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্টস অ্যাক্ট, ১৯৪৭ অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু এ আইন লঙ্ঘন করে ৯৮.৫ শতাংশ অ-মুসলিম জনগোষ্ঠীর এলাকা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' কোনো এক অজানা কারণে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটিতে ভারতীয় পতাকা ও বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলন করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসে ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের শাসন কায়েম করে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯১৫ সালে চাকমা যুবক সমিতি, ১৯১৮ সালে চাকমা যুবক সঙ্ঘ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি, ১৯৩৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ সালে ছিল স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৬০ সালে উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি ও ১৯৭০ সালে রাঙামাটি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সূচনালগ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিগুলোর ন্যায্য অধিকার আদায়ের

লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জে এস এস) ও পাহাড়ি ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা 'শান্তিবাহিনী' গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জে এস এস) শান্তিচুক্তি সই হলে দীর্ঘ ২৪ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান ঘটে। এরপর শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউ পি ডি এফ) ১৯৯৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর গঠিত হয়। তাছাড়া ২০০৮ সালে সংস্কারপন্থী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (এমএনলারমা) নামে আরো একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগুলোর অধিকার আদায়ে এই তিনটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় রয়েছে।

জাতি পরিচয়

পার্বত্য চট্টগ্রামে দশটি ভাষাভাষীর ১১টি জাতি বাস করে। এগুলো হল– চাকমা, মারমা (ভারতে মগ নামে পরিচিত), ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখো, লুসাই, খুমি, খিয়াং, চাক। এদের মধ্যে চাকমাদের জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। তাছাড়া ভারতের মিজোরাম (চাকমা সায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ এবং তার বাইরেও), অরুণাচল, আসাম, ত্রিপুরা রাজ্যে তিন লক্ষাধিক এবং মায়ানমারে এক লক্ষাধিক চাকমা বসবাস করে। সারা পৃথিবীতে চাকমা জনসংখ্যা হবে ১০-১১ লক্ষ। চাকমারা মঙ্গোলিয়ান নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। চাকমারা বিশ্বাস করে, তারা শাক্যবংশের লোক। এ বিষয়ক ইতিহাস রয়েছে। তবে প্রমাণের জন্য শুধু ডিএনএ পরীক্ষাটুকু বাকি। বাংলায় 'চাকমা' এবং ইংরেজিতে 'Chakma' লেখা হলেও চাকমারা নিজেদের 'চাঙমা' বলে থাকেন। বর্মি ও আরাকানিদের কাছে চাকমা সাক, থেক বা থেট নামে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমারা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের সা-ক্ বলে সম্বোধন করে থাকেন। চাকমাদের সম্পর্কে সুনীতিভূষণ কানুনগো লিখেছেন, 'It is a common belief that the Chakmas are tribals, who are not part of Bengali society. The terms tribe, tribals, tribesmen can not be ascribed to the Chakmas. The two terms tribe and tribals are generally used to denote the people who still follow pritive custon, practice hunting and hold animistic beliefs. So far the Chakmas are concerned the characteristics of a tribal society are not applicable to them. The early British writers didn't mention them as tribals. Buchanan Hamiltan, who gives elaborate description of these people, did nowhere in his accounts refer to them as tribals. He calls them as 'a people' and 'a nation'. The Chakmas introduce themselves as 'jati' or 'people' or 'a nation' They are socially and politically organized people. They had more or less defined territory. They had government and a well formed administrative system.' চাকমারা নিজেদেরকে 'জাতি' হিসেবে মনে করেন, উপজাতি হিসেবে নয়। যদিও ঔপনিবেশিকরা, ধর্মান্ধ ও বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদীরা চাকমাদের খুব নিকৃষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চাকমাদের ভাষার নাম 'চাকমা' এবং এটি ইন্দো-ইউরোপী পরিবারভুক্ত একটি ভাষা। চাকমা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা। চাকমাদের লোকসাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। বিভিন্ন পালাগান, ইতিহাস বিষয়ক লোকগান, লোক ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককাহিনীতে পরিপূর্ণ চাকমা লোকসাহিত্য। চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। এটি লেখার জন্য অনেকগুলো কম্পিউটার ফন্টও রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমারা শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি চর্চা সব ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে অন্য জনগোষ্ঠীর তুলনায়। তবুও চাকমা সমাজে আজও অনেক কুসংস্কার রয়েছে, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কথা বাদই দিলাম। চাকমারা কুসংস্কার ত্যাগের জন্য সংগ্রাম করছে। চাকমাদের কিছু কুসংস্কার নিয়ে বলি।

কৃষি বিষয়ক কুসংস্কার

থানমানা পূজা: ৮০-র দশকের দিকে আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন দেখতাম নদীতে পশু পাখি বলি দেওয়া হচ্ছে। এতে শুয়োর, ছাগল আর মুরগি বলি দেওয়া হত দেবতাদের (বিয়াত্রা) উদ্দেশে যাতে বৃষ্টি হয়। যখন এলাকায় দীর্ঘদিন বৃষ্টি হত না, শস্য ফলানো যেত না, তখন পৃথিবী দেবতাকে (বিয়াত্রা) সন্তুষ্ট করার জন্য নদীর ধারে গিয়ে বিয়াত্রা ও গঙ্গার (নদীর দেবী মনে করা হয়) উদ্দেশে শুয়োর, ছাগল ও মুরগি বলি দেওয়া হত। অনেকে বিশ্বাস করতেন, এ পূজার ফলে বৃষ্টি হয় এবং যেদিন পূজা দেওয়া হবে সেদিন তো অবশ্যই বৃষ্টি হবে। আমি ছোটবেলায় দেখতাম, এই থানমানা পুজো উপলক্ষে গ্রামে রীতিমতো উৎসব হত। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে বাস্তবতা বা বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। এ অজ্ঞানতা। বৃষ্টি ঠিকমতো হয় না প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে। গ্রামীণ চাকমা সমাজে গত শতাব্দীর ৯০ দশক পর্যন্ত চালু ছিল এই প্রথা, শুধু

বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার অভাবে। এটি অবশ্যই শহরাঞ্চলে অচল। শহরে ধানচাষ হয় না, আর চাষের জন্য বৃষ্টিরও প্রয়োজন হয় না। শিক্ষিত ভিক্ষু কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব প্রচার এবং আধুনিক সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রাপ্যতার কারণে বর্তমানে এ থানমানা পূজা চাকমা গ্রামীণ সমাজে খুব একটা দেখা যায় না। দুর্গম এলাকাতে থাকলেও থাকতে পারে।

জুম মারানা: চাকমারা নদীর তীরে বসবাস করা জনগোষ্ঠী। তবে একটি অংশ 'জুম' নামক পাহাড়ের ঢালু জমিতে ধানচাষেও অভ্যস্ত। পাহাড়ের গাছ, বাঁশ, ঝোপঝাড় কেটে এক মাস ফেলে রাখা হয়। তারপর তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। খড়কুটো পরিষ্কার করার পর বৈশাখ মাসের শুরুতে ধান বোনা হয়। তাছাড়া তুলার বীজ, বিভিন্ন জাতের সবজি, তিল, মরিচ ইত্যাদিও বপন করা হয়। সময়মতো ধান পাকে এবং সবজি, তিল, তুলোও পাওয়া যায়। চাকমাদের বিশ্বাস, যে কোনো মুহূর্তে ভূতের রোষানলে পড়তে হতে পারে। এতে জুমচাষীর পরিবারের যে কেউ যে কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে, এমনকি মারাও যেতে পারে। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ব্যক্তিরা হয় মারাত্মক অসুখে পড়বে বা মারা যাবে। সেজন্য জুমচাষ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বা মাঝের সময়ে বৈদ্য ডেকে মুরগি, ক্ষেত্রবিশেষে শুয়োর বলি দিয়ে জুমের ভূতকে সন্তুষ্ট করতে হয়। জুমচাষীরা এখনও এ ভূতপূজা (জুম মারানা) করে থাকেন। যদিও বিজ্ঞান বা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ধান ফাং গরানা: সমতল ভূমি বা জুমের ধান যখন পাকে, তখন মুরগি একজোড়া বলি দিয়ে ধান ফাং করা হয়। এটি মূলত ভূত/দেবতাদের উদ্দেশ্য করে পূজা করা হয় ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

চিকিৎসা বিষয়ক কুসংস্কার

হজানা/পেদত দলা (যাদুটোনা): চাকমা গ্রামে ভেষজ ও তান্ত্রিক চিকিৎসক হিসেবে কমপক্ষে ২-৩ জন বৈদ্য (তান্ত্রিক ও ভেষজ চিকিৎসক) বসবাস করেন। গ্রামে এঁদেরকে অনেকে ভয় পায়। আগে এঁদের প্রকোপ অনেক ছিল। শান্তিবাহিনী (পার্বত্য জনসংহতি সমিতির অঙ্গ সংগঠন/সামরিক শাখা) সৃষ্টির পর এঁদের অনেকে শাস্তি পেয়েছিল বিভিন্ন অপরাধের জন্য। আবার অনেকের তান্ত্রিক শাস্ত্রের বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এঁরা এখনো টিকে আছেন। বিভিন্ন ভেষজ লতাপাতা দিয়ে ওষুধ বানিয়ে বিক্রি করেন ও কৃষিকাজ করে সংসার চালান। গ্রামীণ সমাজে অনেকে বিশ্বাস করেন, শত্রুর ক্ষতি করতে গিয়ে তান্ত্রিকতার আশ্রয় নেয় এবং বৈদ্যের (যে

কোনো জাতির বৈদ্য/চাকমা বৈদ্যর) সাহায্যে পেটে মাংসের টুকরো ঢুকিয়ে দেয়। এতে করে যে কোনো ব্যক্তি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। কোনো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করা হলেও রোগ ভাল হয় না। এ কুসংস্কার নিয়ে আমি বরাবরই প্রতিবাদ করতাম। কিন্তু সমাজে এ নিয়ে কথাবার্তা কম হয় এবং যা হয় তা লুকিয়ে/গোপনে। এখন দেখি, গ্রামীণ সমাজে এটিকে কম বিশ্বাস করা হয় এবং পেটে কোনো মারাত্মক রোগ দেখা দিলে আলট্রাসনোগ্রাফি করা হয় এবং পেটে কোনো টিউমার বা পাথর (মূত্রথলির পাথর, পিত্তথলির পাথর, কিডনির পাথর) অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলায় অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা রয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ও সহজলভ্যতার কারণে এ বিষয়ক কুসংস্কারে ভাঁটা পড়েছে।

ভুদ' গুলি (ভূতের গুলি): ভুদ' গুলি বা ভূতের গুলি, বিশ্বাস করা হয় ভূত যখন ক্ষেপে গিয়ে গুলি করে, তখন সেই ব্যক্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এতে তার মুখ বেঁকে যাবে। এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে ভূতকে সন্তুষ্ট করতে হয়। ভূতের উদ্দেশে পূজা হিসেবে শুয়োর (কমপক্ষে এক মন), ছাগল আর মুরগি বলি দিতে হবে। যদিও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটি স্ট্রোক হিসেবে পরিচিত; তবুও গ্রামীণ সমাজের একটি ছোট অংশ এখনও এটিকে ভূতের গুলি হিসেবে মনে করে থাকেন। তবে চাকমাদের শিক্ষার হার ৭০ শতাংশের অধিক হওয়াতে এ কুসংস্কার ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং এটিতে আক্রান্ত হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

গাঙত ভাতজরা দেনা: কেউ যদি ছোটখাটো মাথাব্যথা, জ্বর ইত্যাদির শিকার হয়, তবে মনে করা হয় যে গঙ্গা মা

অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেজন্য তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু ভাত, লবণ আর আন্নো (উনুনের ওপরের কালো ছাই) দিয়ে নদীতে গিয়ে মা গঙ্গাকে পুজো করতে হয়। এটির প্রচলন শহরে নেই। তবে গ্রামে এখনও আছে।

আং গারানা (তান্ত্রিক): মূলত কাউকে ক্ষতি করার জন্য কারো বাড়ির দরজার সামনে বা উপযুক্ত জায়গায় কাগজে কিছু লিখে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। অনেকে মনে করেন, এতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অমঙ্গল বা শারীরিক ক্ষতি হয়ে থাকে। শহরের লোকজন এটিকে বিশ্বাস না করলেও ভয় পেয়ে থাকেন। কিছু কিছু গ্রামে এটিকে বিশ্বাস করা হয় ও ভয় পায়।

দবলা শুগর (মধ্যরাতে শুকর বলি দেওয়া): যদি কোনো ব্যক্তি পেটে কিংবা বুকের কোনো সমস্যায় দীর্ঘদিন ভোগে, তখন গ্রামের বৈদ্যর পরামর্শ মোতাবেক চেলা দেবতার উদ্দেশে দবলা শুগর (মধ্যরাতে শুকর বলি) দেওয়া হয়। অনেক সময় কেউ হারিয়ে গেলে তাকে ফেরত পাওয়ার জন্যও এটি করা হয়। বাস্তবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে না এবং হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়াও যায় না। তবে গ্রামাঞ্চলে এটি এখনও করা হয়। শহরে এর অস্তিত্ব নেই।

সাজ' কুর/ভূতপূজা : শুগর (মধ্যরাতে শুকর বলি)-এর মতো কোনো ব্যক্তি পেটে কিংবা বুকের কোনো সমস্যায় দীর্ঘদিন গ্রামের বৈদ্যর চিকিৎসায় ভাল না হলে সাজ' কুর (সন্ধ্যায় মুরগি বলি) দেওয়া হয়। এতে বিভিন্ন নামের ভূতকে ডাকা হয় এবং পুজো করা হয়। বাস্তবতার সঙ্গে মিল না থাকলেও গ্রামে বৈদ্যরা এটিকে চিকিৎসার একটি মাধ্যম হিসেবে অব্যাহত রেখেছেন। শহরে এর অস্তিত্ব নেই।

ধর্মকাম গরানা: এটিও দবলা শুগর (মধ্যরাতে শুকর বলি) দেওয়ার মতো। বৌদ্ধধর্মের বিচ্যুত একটি অংশ (লুরি– অনেকে মনে করেন মহাযানী বৌদ্ধভিক্ষু) এটি করে থাকেন। পেটের বা বুকের ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মধ্যরাতে শুকর বলি দেওয়া হয়।

সিজিয়ে পানা: সিজিয়ে পানা (ভূতের নজরে পড়া) হচ্ছে, মায়ের দুধ পান করা শিশু সারাক্ষণ কান্নাকাটি করতে থাকে। তখন তারা মায়ের দুধ আর পান করে না। মায়ের দুধ পান করা শিশুকে যদি সিজিয়ে পায়, তখন সরিষার বীজ দিয়ে মন্ত্র পড়া হয় এবং ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এটি শহরে দেখা যায় না।

ভুদে লুগানা /ভূতপূজা: ভুদে লুগানা/ভূতপূজা হচ্ছে ভূত/অপদেবতা কর্তৃক কোনো কিছু লুকনো। গ্রামীণ সমাজে বিশ্বাস, যে কোনো শিশুকে বা গৃহপালিত পশুকে ভূত/অপদেবতা লুকিয়ে রাখতে পারে। যখন অপদেবতা এভাবে কোনো শিশু বা গৃহপালিত পশুকে লুকিয়ে রাখে, তবে তা ফেরত পাওয়ার জন্য অপদেবতার উদ্দেশে মুরগি মানত করা হয়। যখন ফিরে পাওয়া যায়, তখন সেই ভূত/অপদেবতার উদ্দেশে একজোড়া মুরগি বলি দেওয়া হয়। এটি শহরে দেখা যায় না।

এ্যাদা দাগনি: যদি কোনো শিশু খাওয়ার বেলায় অমনোযোগী হয়, রুচি থাকে না অথবা একেবারেই খেতে চায় না, তখন মনে করা হয় যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা দেবতার কুদৃষ্টি পড়েছে। তখন বিভিন্ন ফলমূল ও খাবার জিনিস নিয়ে বৈদ্য ডেকে মন্ত্রপাঠ করা হয়। তখনই শিশুটি, ক্ষেত্রবিশেষে বৃদ্ধ লোকটি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং রুচি ফিরে পেয়ে ঠিকমতো খাবার গ্রহণ করতে থাকে।

বিয়ে বিষয়ক কুসংস্কার

চুঙুলং পূজা: চুঙুলং পূজা মূলত বিয়ের পূজা। এখানে একজন দেবী (পরমেশ্বরী) ও অন্য দুজন দেবতার (কালাইয়ে ও নেনাঙ্যা– নামহীন) উদ্দেশে পুজো করা হয়। এ পুজোর মূল উপকরণ মদ, তিনটি মুরগি আর একটি শুয়োর। গ্রামীণ বৈদ্য পূজামণ্ডপে শুয়োর ও মুরগি বলি দিয়ে সেই মণ্ডপে শুয়োরের ও মুরগির মাথা এবং বলি দেওয়া পশুর– মুরগির রক্ত ও মদ দিয়ে মণ্ডপে পুজো করেন। নববিবাহিত দম্পতি এসে এ পুজোমণ্ডপকে পূজা করবেন। এটি এমন একটি পুজজো যা অনেকে মনে করেন সংস্কৃতি, অনেকে কুসংস্কার। ভারতে বসবাসকারী চাকমাদের একাংশ এটিকে সংস্কৃতি মনে করেন। বাংলাদেশের চাকমাদের বেশিরভাগ মনে করেন এটি কুসংস্কার। বাংলাদেশে এটির প্রচলন নেই বললেই চলে।

এক সংসায্যে বো তুলানা: এক সংসায্যে মানে দ্বিতীয়বার বিয়ে না হওয়া নারী (সধবা)। কোনো মহিলা যদি দ্বিতীয়বার কোনো স্বামী গ্রহণ করে থাকেন, তবে তিনি তাঁর ছেলের বউ ঘরে তুলতে পারবেন না। সামাজিক ধারণা, এতে নতুন বউয়ের অমঙ্গল হতে পারে এবং তাঁরও দ্বিতীয়বার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (হয়তো স্বামী মারাও যেতে পারে)। অর্থাৎ চাকমা সমাজে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও দ্বিতীয়বার বিয়েকে উৎসাহিত করা হয় না— সে পুরুষই বা নারী। কিন্তু নিজের ছেলের বউকে নিজে হাতে ঘরে তুলতে না পারার কারণে শাশুড়ির (দ্বিতীয়বার বিয়ে হওয়া নারীর) মনে খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়।

ভ্রমণ বিষয়ক কুসংস্কার

বুধবারে যাত্রা না করা: চাকমা প্রবাদে আছে, 'বুধবারে গাদ' সাপ্লোও ন লরে" (বুধবারে গর্তের সাপও বের হয় না)। বুধবারে দূরবর্তী কোথাও যাত্রা করা নাকি শুভ বা মঙ্গল নয়।

এটি কেন, এর উত্তর কেউ দিতে পারে না। খনার মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা-এর একেবারে বিপরীত ভাবনা।

যাত্রার প্রাক্কালে খালি কলসী বা খোলা চুলে মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ: চাকমা সমাজে দূরে কোথাও যাত্রার প্রাক্কালে খালি কলসী বা খোলা চুলে মহিলার সাক্ষাৎ পেলে সেটাকে অমঙ্গল বিবেচনা করা হয়। শহরে এসব কেউ মানে না, গ্রামে এখনও কিছুটা হলেও মানা হয়।

পরিবারের মঙ্গল বিষয়ক কুসংস্কার

মাধা ধনা/বুর পারানা: মাধা অর্থ মাথা আর ধনা অর্থ ধোয়া। চাকমা বৈদ্যদের মতে ফি (বিপদ) ১২ প্রকার। চাকমারা যখন মনে করেন ফি (বিপদ) উপস্থিত হয়েছে, তখন তাঁরা পরিশুদ্ধি বা বিপদ থেকে মুক্তির জন্য এটি করে থাকেন। আবার একই ধাঁচে বুর পারা অনুষ্ঠান করেও পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। মাধা ধনা বা বুর পরানা করতে গেলে অবশ্যই চলমান নদীর স্রোত প্রয়োজন। নদীর পাড়ে এটি করা হয়। তিনজন দেবতাকে এতে পুজো করে গৃহস্থ লোকেদের পরিশুদ্ধ করা হয়। সাধারণত নতুন বছরের শুরুতে বাড়িতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা কোনো অমঙ্গল চিহ্ন দেখা দিলে এটি করা হয়। বৈদ্যটি ফুলের মাধ্যমে সেই পরিবারের সকল সদস্যকে মঙ্গল কামনা করে প্রত্যেকের চুল ও কানের গোড়ায় জল ছিটিয়ে মঙ্গল কামনা করেন। গ্রামে এটি স্বাভাবিক ঘটনা, শহরে নেই বললে চলে।

মৃত্যু বিষয়ক কুসংস্কার

মরদপুঅ/জ্ঞাতি খুম গাজ গারানা আর আহ্‌র ভাজানা: পরিবারে কেউ মারা গেলে, শুধু পুত্রসন্তান বা পুরুষ জ্ঞাতির মৃতদেহ দাহ করার জন্য আলংঘর (মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার কাঠামো) বানাতে পারে। কন্যাসন্তান বা কোনো মহিলা ইচ্ছে করলেও অনুমতি দেওয়া হয় না। এর কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া মৃতদেহ দাহ করার পর কিছু ছাই ও হাড় নদীতে ভাসানো হয়। একজন ভাসিয়ে দেন, আরেকজন তাকে তুলে আনেন নদী থেকে। এ ক্ষেত্রেও কন্যাসন্তান বা কোনো মহিলাকে এ কাজ করতে সমাজ বাধা দেয়, নিয়মে নেই এই দোহাই দিয়ে। তবে শুধু পুত্রসন্তান বা পুরুষ জ্ঞাতি এ কাজ করতে পারে।

কুসংস্কারের ফলাফল

সামন্তপ্রভুদের দাপট: সামন্তপ্রভুরা চাকমা হলেও চাকমাদেরকে শিক্ষার সুযোগ করে দেয় নি। তারা চায় নি লোকজন শিক্ষিত হোক, বুদ্ধিমান হোক আর যুক্তিবাদী হোক। তাদের ভয় ছিল, সাধারণ জনগণ শিক্ষিত হলে তারা আর ঠকাতে পারবে না কাউকে। এভাবে কুসংস্কারের সংখ্যা ক্রমে বেড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের কারণে ৭০ দশকের পর সামন্তপ্রভুদের দাপট কমে যায়।

উচ্চশিক্ষার অভাব: ১৮৬৩ সালে চন্দ্রঘোনা নামক স্থানে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম স্কুল শুরু হয়। সামন্তপ্রভুদের দাপটে লোকজন উচ্চশিক্ষিত হতে পারে নি। তবুও দেখা যায় চাকমাদের মধ্যে প্রথম বিএ বিটি পাস করেছিল ১৯১৮ সালে। ১৯১৮-১৯৪৭ পর্যন্ত বিএ পাস ছিল মাত্র ১৬ জন (তার মধ্যে একজন বিএ এবং এমএ ডিগ্রিধারী, একজন বিএসসি ও একজন বিকম ডিগ্রিধারী)। শিক্ষার সুযোগ দেরিতে আসায় উচ্চশিক্ষার হারও দেরিতে বেড়েছে। তাই কুসংস্কারের প্রকোপটা বেশিদিন ছিল।

বিজ্ঞানচর্চার অভাব: বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদী বইয়ের অভাব যেমন আছে, তেমনি কুসংস্কার নির্ণয় ও দূরীকরণে কোনো উদ্যোগও নেওয়া হয় নি এবং সংগঠনও গড়ে তোলা হয় নি।

কুসংস্কার বিরোধী প্রচেষ্টা সমূহ

শিক্ষিত, যুক্তিবাদী ও সাহসী যুব সমাজ: চাকমাদের মধ্যে সামন্তপ্রভুদের দাপট বিংশ শতাব্দীর ষাট দশক পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। ষাট দশকের পর চাকমাদের মধ্যে যেমন শিক্ষার হার বেড়েছে, তেমনি সাহসী যুক্তিবাদী মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। এতে তারা প্রচলিত ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, ভেঙেছে। আস্তে আস্তে তাদের সংখ্যা বেড়েছে এবং এখনও বাড়ছে। চাকমা সমাজে একটা বিশাল অংশ রাজনীতি-সচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক। ধর্মের, সমাজের প্রচলিত বিধানের চেয়ে যুক্তি ও বিজ্ঞানকে বিবেচনায় আনা হয় বেশি বেশি।

রাজনৈতিক দল: ১৯৭২-২০০০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। তখন তারা এ সমস্ত কুসংস্কার থেকে জাতিকে মুক্তি দিয়ে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছিল। এতে সমাজ অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল। বর্তমানেও শিক্ষিত সমাজে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলমান রয়েছে। তাছাড়া নতুন প্রতিষ্ঠিত দুটি রাজনৈতিক দলও কুসংস্কার দূরীকরণে চেষ্টা করছে।

শিক্ষিত বৌদ্ধভিক্ষু : স্বাধীন চাকমা রাজ্যের চাকমা রানী কালিন্দীর আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা জাতি ১৮৬০ সালে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম মতবাদ বদল করে থেরবাদী/হীনযানী বৌদ্ধ ধর্মমতবাদে অনুগামী হয়। থেরবাদী/হীনযানী বৌদ্ধ ধর্মমতবাদ

মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এতে এ দেশগুলোতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের যাতায়াত বেড়ে উঠল। চাকমা জাতি থেকেও যথেষ্ট সংখ্যক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পরিমাণ বেড়ে উঠল। তাঁরা গৌতম বুদ্ধের নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে লাগলেন এবং এখনও করছেন। মূলত চাকমা সমাজের যত কুসংস্কার বিদ্যমান, সেগুলো বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নীতি-আদর্শের বিপরীত হওয়ার কারণে তাঁরা এগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে)। তাঁর আবির্ভাবের (১৯২০-২০১১) কারণে চাকমা জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ কুসংস্কার মুক্ত হয়েছে। যদিও এখন অনেকে অশিক্ষা ও গোঁড়ামির জন্য কুসংস্কারমুক্ত হতে পারে নি।

চিকিৎসা সেবার প্রসার: বাংলাদেশে চিকিৎসাসেবা এখন গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। চাকমা সমাজ থেকেই উঠে এসেছে অনেক ডাক্তার, নার্স ও প্যাথলজিস্ট। হাসপাতালে গিয়ে তাঁরা নিজেদের মাতৃভাষায় (চাকমা ভাষা) কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন। চাকমা ডাক্তাররা চাকমাদের চিকিৎসা বিষয়ক কুসংস্কার নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছেন। এটি সমাজ থেকে কুসংস্কার দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছে ও রাখছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১। শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ- চাকমা জাতি, ১৯০৯।

২। চাকমা পূজাপার্বণ: বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান, ১৯৮৯।

৩। সুপ্রকাশ রায়: ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম; ১৯৬৬।

৪। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ: জ্ঞানেন্দুবিকাশ চাকমা, ১৯৯১।

৫। প্রদীপ্ত খিসা: পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, ১৯৯৬।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

৭। Suniti Bhushan Quningo: Chakma Resitance to British Domination, 1998.

৮। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ: পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন সংহিতা, ২০১০।

৯। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম : বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিক গবেষণা- ১ম খণ্ড।

শীতকালে অস্ত্রোপচার করাটা কি বেশি নিরাপদ?

ভবানীপ্রসাদ সাহু

একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে, কোনো অপারেশন বা অস্ত্রোপচার করতে হলে শীতকালে করাটাই ভাল, কারণ তাহলে জীবাণু সংক্রমণ হয়ে কাটা জায়গায় ঘা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমবে। কাটা জায়গাটা তাড়াতাড়ি শুকিয়েও যাবে। বিশেষত আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এ ধরনের বিশ্বাস বেশ ভালোই লোকের মনে গেড়ে বসেছে।

এই ধরনের বিশ্বাস গড়ে ওঠার পেছনে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। বিশেষত যখন অ্যান্টিবায়োটিকের প্রচলন ভালোভাবে হয় নি, জীবাণু সংক্রমণ ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার আধুনিক উন্নত জ্ঞান এতটা জানা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, তখন ভারতের মতো দেশে গ্রীষ্ম-বর্ষার নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে বিশেষ কিছু জীবাণুর বৃদ্ধি ও প্রকোপ বেশিই ঘটত, যে কারণে অস্ত্রোপচার কক্ষ বা অপারেশন থিয়েটারগুলি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। অবশ্য এর পেছনে শুধু জীবাণুর ব্যাপারটা নয়, সার্জেন ও অন্যান্যদের স্বস্তি, ঘাম হওয়া আটকানো— এসব দিকও আছে।

অস্ত্রোপচারের পরে কাটা জায়গায় যে ধরনের জীবাণু সংক্রমণ ঘটে পুঁজ হতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস জাতীয় জীবাণুগুলি। এগুলির বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা হল ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে একটু বেশি। এইভাবে যে সব জীবাণুর এই মাঝারি তাপমাত্রার (২৫ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ঘটে, সেগুলিকে বলা হয় 'মেসোফিলিক' জীবাণু। উষ্ণ রক্তের প্রাণীর সমস্ত পরজীবীও (যেমন ম্যালেরিয়ার)

এই গোত্রের। যে কারণে গরমের দেশেই এই ধরনের পরজীবীজনিত রোগ বেশি দেখা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'সাইক্রোফিলিক' জীবাণু তাদের বলা হয়, যারা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচের তাপমাত্রায় বেশি বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে কোনো কোনোটি আবার মাইনাস সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এগুলি মানুষের ক্ষেত্রে কোনো রোগের সৃষ্টি না করলেও ফ্রিজে রাখা খাবার নষ্ট করে দেয়। যাঁরা ফ্রিজে খাবার ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, যে যাক বাবা, খারাপ হওয়ার ভয় নেই, তাঁরা ব্যাপারটা মাথায় রাখুন। আরও কিছু জীবাণু আছে, যেগুলোও মানুষের কোনো রোগ সৃষ্টি করে না (নন-প্যাথোজেনিক) এবং ৫৫ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো উচ্চ তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। এদের বলা হয় 'থার্মোফাইল'। এরা টিনে বদ্ধ খাবার নষ্ট করে। এমনকি ২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও বৃদ্ধি পায় এমন জীবাণুর কথাও জানা আছে।

যাই হোক, অস্ত্রোপচারের কাটা জায়গায় তথা হাসপাতালে সংক্রমণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে স্ট্যাফাইলোকক্কাস ধরনের জীবাণুই। হাসপাতালে নানা ধরনের রোগী ও অন্যান্য উৎস থেকে এই স্ট্যাফাইলোকক্কাসের একটি বিশেষ ধরন সংক্রামিত হয়, যাকে অনেক সময় 'হসপিটাল স্ট্রেন' নামে অভিহিত করা হয়। এটি নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ক্ষমতা গড়ে তোলে। তাই বিপদ ঘটে অনেক বেশি। এমনকি অনেক সময় কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে না মারার ফলে মহামারী আকারে দেখা দেয়। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে 'এপিডেমিক স্ট্রেন' বলে।

হাসপাতালে তথা অস্ত্রোপচারের কাটা জায়গায় এই ধরনের সংক্রমণ আটকাতে যে সব বিষয়ে কঠোর সতর্কতা নেওয়া উচিত, সেগুলি হল— (১) স্ট্যাফাইলোকক্কাস ও এই ধরনের জীবাণুতে আক্রান্ত রোগীদের কঠোরভাবে আলাদা করা, বিশেষত যাদের খোলা ক্ষত (ওপেন উন্ড) আছে। (২) যে সব সার্জেন তথা চিকিৎসক, নার্স ও হাসপাতাল কর্মচারীর মধ্যে এই ধরনের জীবাণু সংক্রমণ আছে, তাদের চিহ্নিত করা ও জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে আসতে বারণ করা। (৩) অস্ত্রোপচার কক্ষে কঠোর জীবাণুমুক্ত পরিবেশ সুনিশ্চিত করা।

প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রোপচারের পর সংক্রমণ আটকাতে এগুলিই আসল পথ। গরমকাল না শীতকাল, এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। অস্ত্রোপচার কক্ষে, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিতে, সার্জেন-নার্স প্রমুখের শরীরে যদি জীবাণু থাকে, তবে শীতকালেও সংক্রমণ ঘটতে পারে। আমাদের দেশে তো বটেই, অনেক উন্নত দেশেও এই ধরনের সংক্রমণের ঘটনা ঘটে। তবে আমাদের এখানে এর হার অনেক বেশি। তার প্রধান কারণ উষ্ণ অঞ্চলীয় দেশ হওয়ার জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে গাফিলতি ও ঢিলেঢালা ভাব।

তবে গ্রীষ্মকালের চেয়ে বা ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমের চেয়ে শীতকালের ঠাণ্ডা, শুকনো আবহাওয়ায় অস্ত্রোপচার করাটা কিছু সার্জেন বেশি পছন্দ করেন। এর প্রধান কারণ নিজেদের ও আরো বেশি করে রোগীদের স্বস্তি। আমাদের দেশে উচ্চমূল্যের সামান্য সংখ্যক প্রাইভেট হাসপাতাল ছাড়া, সরকারি হাসপাতাল ও অধিকাংশ নার্সিংহোমেই বড়জোর অস্ত্রোপচার কক্ষটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা হয়, কিন্তু তার পর রোগীকে যেখানে রাখা হয়, সেই সাধারণ ওয়ার্ড শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা থাকে না। মূলত আর্থিক কারণই এর পেছনে কাজ করে। আর এই কারণে, গরম ভ্যাপসা পরিবেশে, হয়ত বা ভিড়ে-ঠাসা জেনারেল ওয়ার্ডে (যা অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালের সাধারণ চিত্র), সদ্য অস্ত্রোপচার হওয়া রোগীর কষ্টের শেষ থাকে না। এই সুযোগে কিছু মেসোফিলিক জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটতে পারে এবং ভিড়ে ভিড়াক্কার ওয়ার্ডে অন্য রোগীর থেকেও আসতে পারে। তবু এ প্রসঙ্গে বলা যায় কম আর্দ্রতার শুষ্ক পরিবেশ সাধারণভাবে জীবাণুর বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক না হলেও, স্ট্যাফাইলোকক্কাস জাতীয় জীবাণু বিশেষত তার স্পোর, এমনকি কয়েক মাসও শুষ্কতা সহ্য করে দিব্যি বেঁচে থাকে এবং সুযোগ পেলে তার বাড়বাড়ন্ত ঘটে। তাই ভ্যাপসা আবহাওয়ার চেয়ে, শুকনো আবহাওয়ায় জীবাণু সংক্রমণ কম ঘটবে— এ ধারণাটিও ঠিক নয়।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, গরমকালের চেয়ে শীতকালে অস্ত্রোপচার বেশি পছন্দ করার ব্যাপারে সাধারণভাবে বহু রোগীর মধ্যে যে ধারণা রয়েছে, তার যৌক্তিকতা এখনকার দিনে খুব একটা নেই। অস্ত্রোপচারের স্থানে জীবাণু সংক্রমণ ঘটবে কি ঘটবে না, তা মূলত নির্ভর করে অস্ত্রোপচার কক্ষ, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, সার্জেন-নার্স ইত্যাদিরা জীবাণুর বাহক কিনা, হাসপাতালের পরিবেশ— এসবের ওপরেই।

সেঁক নিয়ে সাতপাঁচ

ভুবন পাল

চোট লাগা, মুচকে যাওয়া, পেশিতে টান ধরা থেকে ফোড়া-- নানা কারণে গরম বা ঠাণ্ডা সেঁক দিয়ে থাকি। তবে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিও কম নেই। যেমন হাড়ের চোটের কথাই ধরুন। এ বলে গরম সেঁক দাও, তো ও বলে ঠাণ্ডা। কেউ আবার গরম-ঠাণ্ডার পক্ষে। এসব শুনলে ধন্দ লাগেই, কোনটা করব রে বাবা! তাই সেঁক গরম না ঠাণ্ডা এবং কখন, কোথায় তা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করি। এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, অনেক শারীরিক সমস্যা উপশমেই সেঁক একটা বড় ভূমিকা নেয়। বিশেষত চোট-আঘাত, বিভিন্ন ধরনের সন্ধিপ্রদাহ (আর্থ্রাইটিস), রক্ত জমে যাওয়া (হেমাটোমা) প্রভৃতি সমস্যায়। বিজ্ঞান মেনে প্রয়োগ করলে সেঁক চিকিৎসায় খুবই ভাল ফল মেলে।

সেঁক প্রধানত দু ধরনের-- গরকো ঠাণ্ডা। গরম সেঁককে আবার দু ভাগে ভাগ করা হয়– ভেজা (ময়েস্ট) ও শুকনো (ড্রাই)।

গরম সেঁক: শরীরের অগভীর (সুপারফিসিয়াল) অংশে এই গরম সেঁক বিভিন্ন উপায়ে দেওয়া যায়, যেমন গরম পুঁটলি, প্যারাফিন বাথ, গরম বালি বা গরম লবণের সাহায্যে। এই পদ্ধতিতে শরীরের এক থেকে দেড় সেন্টিমিটার গভীর অবধি তাপ পৌঁছানো যায়। এতে গরমের রেশ ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট অবধি থাকে। যেহেতু গরম সেঁক দেওয়ার সময় ব্যথা, মাংসপেশী এবং লিগামেন্টের আড়ষ্টতা সাময়িকভাবে কমে যায়, এই সময় প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করতে হয়। এই প্রক্রিয়া বেশ কার্যকর। ঠিকভাবে সেঁক দিতে পারলে সন্ধিসমূহের আড়ষ্টতা অনেকাংশে কমে যায়।

অন্য যেভাবে গরম সেঁক দেওয়া যায়, যাতে গরম ক্রিয়া অনেক গভীর অবধি পৌঁছতে পারে। যেমন, আলট্রাসনিক অথবা শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি অথবা আই এফ টি যন্ত্রের সাহায্যে। এই প্রক্রিয়ায় শরীরের গভীরতম অংশে এবং সন্ধি সমূহে যেমন মেরুদণ্ড বা কোমরের জোড় অবধি তাপ যায়। এই প্রক্রিয়ায় রম সেঁক পৌঁছে দেওয়া যায় ৩-৬ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত।

গরম সেঁক খুবই কাজের। কিন্তু না জেনেশুনে যত্রতত্র ব্যবহার করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মনে রাখবেন, তাৎক্ষণিক চোট, আঘাত অথবা প্রদাহজনিত কারণে ফুলে যাওয়া অংশে কখনও গরম সেঁক দিতে যাবেন না। সংক্রামিত অংশেও গরম সেঁক চলবে। ভুল করে বা অসাবধানে গরম সেঁক দিয়ে ফেললে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

গরম সেঁক কীভাবে কাজ করে: শরীরের কলা (টিস্যু) গরমের জন্য তার প্রসারতা বাড়াতে পারে। তা ছাড়া মাংসপেশীর খিঁচুনি (স্প্যাজম) কমে যায়। গরমের জন্য শরীরের সেই অংশের রক্ত-চলাচল বেড়ে যায়, যার জন্য ব্যথা উৎপাদনকারী রাসায়নিক পদার্থগুলি ব্যথার জায়গা থেকে সরে যায়।

আসা যাক ঠাণ্ডা সেঁকের কথায়। ঠাণ্ডা সেঁক সাধারণত মারাত্মক ধরনের (অ্যাকিউট) চোট এবং রক্ত জমা এবং ফুলে যাওয়া অংশে দেওয়া হয়।

ঠাণ্ডা সেঁকের ক্রিয়া: খেলতে খেলতে বা অন্যভাবে লেগে গেলে বরফ ঘষে দেওয়ার রেওয়াজ বহু দিন ধরে চলে আসছে। এখন বাড়িতে ফ্রিজ থাকায় কাজটা আরও সহজ হয়েছে। অনেকে বাড়িতে আইস ব্যাগও থাকে। যে অংশে ঠাণ্ডা সেঁক দেওয়া হয়, সেই অংশে রক্তনালী ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যার ফলে রক্ত জমা হওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং সেই কারণেই শরীরের চাপ (টিস্যু টেনসন) কমে যায়, যার ফলে ব্যথাও কমে যায়। তাছাড়া, সেঁক দেওয়া অংশে আংশিক অসাড়তাও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেখা যায়। বেশ কিছুক্ষণ সেঁক দেওয়ার ফলে মাংসপেশীর আড়ষ্টতা খানিকটা কমে যায়।

এভাবে কিছু নিয়ম মেনে শরীরের বিভিন্ন অংশে সঠিকভাবে সেঁক দিয়ে মানুষ সাময়িকভাবে উপকৃত হতে পারেন।

পাঠানি এক আশ্চর্য প্রতিভার নাম

সমীরকুমার ঘোষ

পাঠানি সামন্ত চন্দ্রশেখর জ্যোতির্বিদ্যায় এক বিস্ময় প্রতিভার নাম। অন্তত ভারতবাসী হিসাবে গর্বের সঙ্গে যাঁর নাম জানা উচিত ছিল, প্রয়াণের ১০০ বছর পার করেও তাঁকে আমরা চিনি নি। গবেষণা করতে গেলে বিদেশ যেতে হয়, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি না হলে চলে না জাতীয় যে সব ওজর আমরা দেখাই পাঠানি নিজের জীবন দিয়ে তার যাবতীয় জবাব দিয়ে গিয়েছেন

গত সংখ্যার পর

অ্যাস্ট্রোনমি তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা শুরু একেবারে সভ্যতার ঊষা লগ্ন থেকে। তখন খালি চোখে গ্রহ-তারা পর্যবেক্ষণই ছিল রীতি। আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, শতানন্দ, শ্রীপতি প্রমুখ কিংবদন্তী হয়ে-ওঠা ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা সবাই যা কিছু পর্যবেক্ষণ ও গণনা করেছেন সবই খালি চোখে দেখার ভিত্তিতে। এই কারণেই এঁদের ‘ন্যাকেড আই অবজার্ভার’ বলে। পাঠানি চন্দ্রশেখরকে এই দলের শেষতম প্রতিনিধি বলা যায়। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের আকর গ্রন্থ বলে ধরা হয় সূর্যসিদ্ধান্ত, আর্যভটীয়, পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা, ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত শিরোমণিকে। সামন্ত চন্দ্রশেখরের ‘সিদ্ধান্ত দর্পণ’কেও ওই ধ্রুপদী সৃষ্টির মর্যাদা দেওয়া হয়। চন্দ্রশেখর তাঁর দীর্ঘ জীবনে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন তা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নথিভুক্ত করেছেন এই গ্রন্থে, সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যোগ করেছেন আকরগ্রন্থের টীকা, তথ্য। আগের দিনের মতোই চন্দ্রশেখর তাঁর সূত্র, তথ্য ইত্যাদি লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায়, সর্বোপরি শ্লোকবদ্ধ ছন্দে। এতে শুধু তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগাধ জ্ঞানের পরিচয়ই মেলে না, মেলে কবিত্বশক্তির পরিচয়ও। চন্দ্রশেখর প্রায় দেড়শো বছর আগে যা সৃষ্টি করে গিয়েছেন, এখনও তা প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। সিদ্ধান্ত দর্পণ-এর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এখনও তৈরি হয় ওড়িশার সবচেয়ে জনপ্রিয় পঞ্জিকাটি। তাই এর এক গভীর সামাজিক তাৎপর্যও রয়েছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পঞ্জিকাতে সিদ্ধান্ত দর্পণের যে গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী গত ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হচ্ছে, তার সঙ্গে এখনকার পর্যবেক্ষণ মিলে যাচ্ছে। সেই কারণেই তা কালজয়ী।

যুবক চন্দ্রশেখর যখন আকাশ চিনতে শিখেছেন, গণনা করতে শিখেছেন, তখনই তাঁর নজরে এসেছে প্রাচীন গ্রন্থের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ অনেক সময়েই মিলছে না। তখন থেকেই শুরু বিচ্যুতিগুলো নথিবদ্ধ করার কাজ। তাঁর বয়স তখন মাত্র ২৩। বছরতিনেক পরে সেগুলো সূত্রবদ্ধ করতে শুরু করেন। চলতে থাকে কাজ, পর্যবেক্ষণ, গণনা, আর তা লেখার কাজ। এইভাবে সিদ্ধান্ত দর্পণের রচনা শেষ করেন ১৮৬৯ সালে। তখন চন্দ্রশেখরের বয়স ৩৪ বছর। ওড়িশার খণ্ডপাড়া নামে যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানে তখনও তালপাতার ওপরেই লেখার চল ছিল। চন্দ্রশেখরও সমস্ত রচনা তালপাতায় লিখেছিলেন। লিখেছিলেন মাতৃভাষা ওড়িয়াতেই। কিন্তু ওড়িয়াতে লিখলে তা বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবে না, সম্ভবত এই ভাবনা থেকেই পুরো গবেষণাকে দেবনাগরী ভাষায় লিখতে শুরু করেন। শ্লোকের আকারে। আর সেই রচনা কাগজে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হতে লাগিয়ে দেয় আরও ৩৪ বছর। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয় ‘সিদ্ধান্ত দর্পণ’। এই কাজে যে দুটি গ্রন্থকে চন্দ্রশেখর দিক্‌দর্শক হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, সেই বই দুটি ‘সূর্য সিদ্ধান্ত’ ও ‘সিদ্ধান্ত শিরোমণি’।

পাঠানির হাতে লেখা তালপাতার পুঁথি

একথা আগেই জানানো হয়েছে, এমন অসাধারণ এক পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে যেত, যদি না কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং কটক কলেজের (বর্তমানে র‍্যাভেনশ কলেজ) অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁকে আবিষ্কার করতেন। চন্দ্রশেখর এক বর্ণও ইংরেজি জানতেন না। পণ্ডিতপ্রবর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ছিল জহুরির চোখ। ঠিক খুঁজে নিয়েছিলেন ওড়িশার অজ গাঁয়ে থাকা রত্নকে। ন্যায়রত্নের উদ্‌যোগেই ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করে। তবে তার আগে অবশ্য পুরীরাজ গজপতি তাঁকে 'হরিচন্দন মহাপাত্র' উপাধিতে সম্মানিত করেন। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানেই কলকাতার ইন্ডিয়ান ডিপোজিটরি থেকে প্রকাশিত হয় 'সিদ্ধান্ত দর্পণ'। আর্থিক সহায়তা করেছিলেন অথমল্লিকের রাজা এবং অংশত ময়ূরভঞ্জের রাজা। যোগেশচন্দ্র ইংরেজিতে বইটির ৫৬ পাতার একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সেই ভূমিকার জোরেই চন্দ্রশেখরের মহামূল্যবান আবিষ্কার পৌঁছে যায় বিশ্বের দরবারে। দুই আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার' (১৮৯৯, ৫২, ৪৩৬) এবং 'নলেজ' (১৮৯৯, ২২, ২৫৭) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। পরে, ১৯৭৫ ও ৭৬ সালে সিদ্ধান্ত দর্পণের দুটি ওড়িয়া অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

পাঠানি সামন্ত চন্দ্রশেখর পুরী-রাজের সভায় প্রধান জ্যোতির্বিদ নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৪ সালে তিনি অঙ্ক কষে বার করেছিলেন শুক্র গ্রহের দরুন সূর্যগ্রহণের (ভেনাস ট্রানজিট অভ সান) সময়। জলের মধ্যে তেল ঢেলে নিজস্ব পদ্ধতিতে তা পর্যবেক্ষণও করেন। তাঁর একমাত্র সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল একটি মার্কিন পত্রিকায়, ১৮৭৪ সালে। সেই নথি ওড়িশা সরকারের কাছে আছে।

অরুণকুমার উপাধ্যায় সিদ্ধান্ত দর্পণের অনুবাদ করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন শুক্রের কারণে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে চন্দ্রশেখর লিখেছিলেন, 'শুক্রের কারণে সূর্যগ্রহণ– শুক্রের কারণে সূর্যগ্রহণ বার করতে তাদের বিম্ব (কৌণিক ব্যাস) এবং আশপাশে থাকা অন্য তারা-গ্রহদের মাপের কথা বলা হয়েছে। ৪৯৭৫ কলিযুগে (ইংরেজি ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) বৃশ্চিক রাশিতে শুক্রের কারণে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তারপরে শুক্র বিম্বকে দেখা গিয়েছিল। তার মাপ ছিল সূর্য বিম্বের ১/৩২ ভাগ। যা ৬৫০ যোজনের সমান। সুতরাং এটা ভালভাবেই প্রমাণিত যে শুক্রের বিম্ব এবং গ্রহগুলো সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট।'

চন্দ্রশেখর সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে জানতেন, না নিজে গণনা করে বার করেছিলেন, এই প্রশ্নটা ওঠে। দ্বিতীয়টিকে ঠিক বলে মনে করা হয়। কারণ সেই সময় তাঁর ওখানে কোনো ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কাজকর্ম হয়েছিল, এমন প্রমাণ মেলে না। পালেরমো পর্যবেক্ষণাগার (অবজার্ভেটরি) থেকে ইতালীয় পর্যবেক্ষকরা এসেছিলেন বাংলার মুদ্দাপুরে। জায়গাটা ওড়িশার কাছাকাছি। সেখান থেকে কোনো খবর খণ্ডপাড়ায় পৌঁছে থাকতে পারে। এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে যদি চন্দ্রশেখরের কানে গিয়েও থাকে, তিনি গণনা করে না দেখে সে সবে বিশ্বাস করার পাত্র ছিলেন না।

সামন্ত শুধু সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণই করেননি, হিসেব কষে তা আগেই বার করে ফেলেছিলেন। তবে গোটা বিশ্ব সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের সূর্যগ্রহণ নিয়ে মাতামাতি করলেও পাঠানি তার কিছুই জানতেন না। তবুও তাঁর সূর্য ও শুক্র গ্রহের বিম্ব ও আপাত কৌণিক ব্যাসের অনুপাত ১/৩২ ভাগ নির্ণয় রীতিমতো চমকপ্রদ।

পর্যবেক্ষণের দিনটি ছিল ৯ ডিসেম্বর ১৮৭৪। সূর্য ও শুক্রের আপাত কৌণিক ব্যাস ছিল যথাক্রমে চাপের (আর্ক) ৩২ মিনিট, ২৯ সেকেন্ড এবং চাপের ১ মিনিট, ৩ সেকেন্ড। সুতরাং এর অনুপাত নির্ণীত হতে পারে ১:৩০.৯৩।

কক্ষপথের বক্রতার জন্য একটা গ্রহণের থেকে অন্য গ্রহণের অনুপাতের তারতম্য হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে ২০০৪-এর গ্রহণের কথা বলা যায়। সেবার সূর্যের আপাত ব্যাস ছিল ৩১ মিনিট, ৩১ সেকেন্ড এবং শুক্রের চাপের ৫৮ সেকেন্ড। ফলে অনুপাত দাঁড়িয়েছিল ১:৩২.৬।

মনে রাখতে হবে, পাঠানির যাবতীয় গণনা টেলিস্কোপ ছাড়াই, হাতে-তৈরি কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যে। তাতেই যে নিখুঁত গণনা

করেছেন তা তুলনাহীন। ট্রানজিট অভ ভেনাসের যে তাত্ত্বিক গণনা এবং পর্যবেক্ষণ পাঠানি করেছিলেন, তার সাফল্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় জেরেমিয়া হোরোক্সের।

সিদ্ধান্ত দর্পণে মোট ২৪টি অধ্যায় আছে। সব মিলিয়ে শ্লোক আছে ২৫০০। এর ২২৮৪টি শ্লোকই চন্দ্রশেখরের রচনা। ২১৮টি পূর্বসূরিদের কাছ থেকে নেওয়া। সিদ্ধান্ত দর্পণের পুরোটাকে পাঁচটা পর্বে ভাগ করা হয়--মধ্যাধিকার, স্ফুটাধিকার, ত্রিপ্রশ্নাধিকার, গোলাধিকার ও কালাধিকার। প্রথম দুটি পর্বে আলোচনা করা হয়েছে গ্রহদের তুলনামূলক গড় গতি এবং প্রকৃত অবস্থান। তৃতীয় পর্বের বিষয় কাল, সময় এবং দিকের নিরিখে গতি। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে গোলকাকার ত্রিকোণমিতির মতো প্রাসঙ্গিক গণনা। সময়ের বিভিন্নভাবে সময়ের বিচার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম পর্বে। সিদ্ধান্ত দর্পণে অধ্যায়ের (যাকে চন্দ্রশেখর প্রকাশ বলেছেন) বিন্যাস এবং শ্লোকের ভাগগুলো এরকম।

সারণি-১

পর্ব অনুযায়ী অধ্যায়/প্রকাশ ও শ্লোকগুলির বিন্যাস নিম্নরূপ

ক্রম	পর্ব	অধ্যায়	শ্লোকসংখ্যা
১	মধ্যাধিকার	১-৪	২০৪
২	স্ফুটাধিকার	৫-৬	৩৭২
৩	ত্রিপ্রশ্নাধিকার	৭-১৫	৭৩৬
৪	গোলাধিকার	১৬-২১	৯০১
৫	কালাধিকার	২২-২৪	২৮৭
	মোট	**২৪**	**২৫০০**

সিদ্ধান্ত দর্পণে যে সব তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তা একজন লোকের পক্ষে কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে পণ্ডিতেরা রীতিমতো বিস্মিত। হাজার বছর ধরে চলে আসা হিন্দু জ্যোতিষে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা তিনি যাচাই করেছেন, ভুলত্রুটি ধরেছেন এবং নথিবদ্ধ করেছেন। বহু জায়গাতেই তিনি নতুন বৈশিষ্ট্য, আরও উন্নত গণনা পদ্ধতি এবং ফল নির্ধারণে পূর্বসূরিদের ছাপিয়ে গিয়েছেন। জ্যোতির্বিদ্যায় যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সামন্ত চন্দ্রশেখরের অবদান রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান চারটি হল– পর্যবেক্ষণ, গণনা, মাপজোকের পদ্ধতি এবং তত্ত্ব ও মডেল।

আগেই বলা হয়েছে চন্দ্রশেখর সারাজীবনই পর্বেক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন। তাত্ত্বিক প্রশ্ন বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত দর্পণে যা কিছু নথিভুক্ত করেছেন, সবটা পর্যবেক্ষণ করে তবেই লিখেছেন। আর রাতের পর রাত জেগে কাজ করার কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে। সারাজীবন অজীর্ণরোগ (ডিসপেপসিয়া) ও পেটের শূলবেদনায় (কলিক) ভুগেছেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও কি নিখুঁত কাজ করে গিয়েছেন! আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে তাঁর উল্লিখিত তথ্যের ফারাক উনিশ-বিশ। একটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান পেশ করলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। (সারণি-২ ও ৩ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রশেখর চাঁদের গতি নিয়েও অসাধারণ কাজ করেছিলেন। নিজেই লেখেছেন, 'চাঁদের গতি বড়ই অদ্ভুত। আমি বহুদিন ধরে তা লক্ষ্য করেছি। মাণ্ডার সংশোধনের পাশাপাশি আমি আরও তিনটি সংশোধন করছি, যেগুলো মূলত তুঙ্গতন্ত্র, পক্ষিকা ও দিগংশ। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সিদ্ধান্ত দর্পণের ভূমিকায় লিখেছেন, চন্দ্রশেখর এমন সব সংশোধন আবিষ্কার করেছেন, যা একেবারেই মৌলিক। মৌলিক মানে যা আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের জানা ছিল না। যোগেশচন্দ্র আরও লিখেছেন, চন্দ্রশেখরই প্রথাগত ধারার একমাত্র ভারতীয় জ্যোতির্বিদ, যিনি তিনটের সবকটিই পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের মাপজোক করেছেন চূড়ান্ত নিখুঁতভাবে। পশ্চিমী জ্যোতির্বিদরা তুঙ্গতন্ত্রের সর্বোচ্চ মান নির্ধারণ করেছেন ১ ডিগ্রি ১৭ মিনিট, সেখানে সামন্তর সর্বোচ্চ মান ছিল ২ ডিগ্রি ৪০ মিনিট। পক্ষিকা ও দিগংশের মান চন্দ্রশেখর বার করেছিলেন যথাক্রমে ৩৮ মিনিট ১২ সেকেন্ড এবং ১২ মিনিট, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা মতে তা হল ৩৯ মিনিট ৩১ সেকেন্ড এবং ১১ মিনিট ৯ সেকেন্ড।

১১ জুন ১৯০৪ -এ মারা যান। সারাটা জীবন কাটিয়েছেন দারিদ্র্য আর অসুস্থতায়। তবু নিজের গবেষণায় এতটুকু ছেদ পড়তে দেন নি। সান্ত্বনা বলতে ১৮৭০-এ পুরীর রাজা গজপতির উপাধি দান ও ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'মহামহোপাধ্যায়' ও মাসে ৫০ টাকা বৃত্তি। দুঃখের কথা, তাঁর প্রয়াণের ১০০ বছর পার হয়ে গেলেও ওড়িশার বাইরে কেউই তাঁর নাম জানে না!

সারণি-২

দিনের হিসাবে গ্রহের নাক্ষত্র পর্ব (সাইডিয়ারিয়্যাল পিরিয়ড)

গ্রহ	সূর্যসিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তশিরোমণি	সিদ্ধান্ত দর্পণ	ইউরোপীয় হিসাব ১৮৯৯-এর	আধুনিক হিসাব
সূর্য	৩৬৫.২৫৮৭৫	৩৬৫.২৫৮৪৩	৩৬৫.২৫৮৭৫	৩৬৫.২৫৬৩৭	৩৬৫.২৫৬৩৬
চন্দ্র	২৭.৩২১৬৭	২৭.৩২১১৪	২৭.৩২১৬৭	২৭.৩২১৬৬	২৭.৩২১৬৬১৫
মঙ্গল	৬৮৬.৯৯৭৫	৬৮৬.৯৯৭৯	৬৮৬.৯৮৫৭	৬৮৬.৯৭৯৪	৬৮৬.৯৭৯৮২
বুধ	৮৭.৯৫৮৫	৮৭.৯৬৯৯	৮৭.৯৭০১	৮৭.৯৬৯২	৮৭.৯৬৯২৫৬
বৃহস্পতি	৪৩৩২.৩২০৬	৪৩৩২.২৪০৮	৪৩৩২.৬২৭৮	৪৩৩২.৫৮৪৮	৪৩৩২.৫৮৯
শুক্র	২২৪.৬৯৮৫	২২৪.৯৬৭৯	২২৪.৭০২৩	২২৪.৭০০৭	২২৪.৭০০৮০
শনি	১০৭৬৫.৩৯৪৮	১০৭৬৫.৮১৫২	১০৭৫৯.৭৬০৫	১০৭৫৯.২১৭৯	১০৭৫৯.২৩
চাঁদের পাত/নোড	৬৭৯৪.৩৯৪৮	৬৭৯২.২৫৩৫	৬৭৯২.৬৪৪	৬৭৯৩.২৭০	৬৭৯৩.৪৭০

ওড়িশায় তাঁর নামে অনেক কিছু আছে। ভুবনেশ্বরে গড়ে তোলা হয়েছে পাঠানি সামন্ত প্ল্যানেটারিয়াম। যোগেশচন্দ্র পাঠানিকে টাইকো ব্রাহের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। দুজনের মধ্যে এত বৈপরীত্য যে এই তুলনাও সমীচিন নয়। টাইকো তাঁর প্রতিভার জোরে ডেনমার্কের রাজার বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। রাজা তাঁকে একটা গোটা দ্বীপই দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সেখানে গড়ে দিয়েছিলেন পর্যবেক্ষণাগার। রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় টাইকো ব্রাহের গবেষণাকাজ সহজতর হয়েছিল। টাইকো ছাত্র হিসাবে পেয়েছিলেন কেপলারকে। টাইকোর সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভর করেই কেপলার গ্রহের গতি সম্পর্কিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। আর পাঠানি চন্দ্রশেখরের যাবতীয় লড়াই

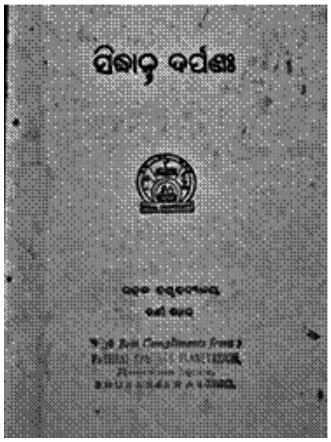

ওড়িয়ায় লেখা সিদ্ধান্ত দর্পণ

এককভাবে, পাশে কাউকে পাননি। পাশ্চাত্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান তখন কত এগিয়ে গিয়েছে। আকাশ দেখার কত উন্নত যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে– সে সব কিছুরই নাগাল পাননি, সাহায্য পাননি। পেলে কী হত বলা যায় না। তবুও কারও সাহায্য ছাড়াই এককভাবে তিনি যে আবিষ্কার করেছেন, তার নিরিখে টাইকোকে পিছিয়ে রাখতেই হবে। অন্যরা টেলিস্কোপের সাহায্যে যা দেখেছিলেন, চন্দ্রশেখর দেখেছিলেন খালি চোখে।

চন্দ্রশেখর সম্পর্কে আর একটি অভিনব ঘটনার কথা জানিয়ে শেষ করি। আকাশের গ্রহতারাদের নিয়ে গণনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার পাশাপাশি নিজের মৃত্যু নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পাঠানি চন্দ্রশেখর। আর সেই অনুযায়ী পুরো রাস্তা পাড়ি দিয়ে নির্ধারিত দিনেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এসে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

সারণি-৩

সূর্য ও চন্দ্রের সমীকরণ

(দ্য গ্রেটেস্ট ইকুয়েশন অভ সান অ্যান্ড মুন)

আকাশবস্তু	সূর্যসিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত দর্পণ	১৮৯৯-এর পশ্চিমী জ্যোতির্বিদ্যা
	০ ’ ”	০ ’ ”	০ ’ ”
সূর্য	২ ১০ ৩১	১ ৫৫ ৩৩	১ ৫৫ ১৯
চন্দ্র	৫ ২ ৪৬	৫ ১ ১০	৬ ৩ ৪১

তথ্যঋণ: সামন্ত চন্দ্রশেখর: দ্য ন্যাকেড আই অ্যাস্ট্রোনমার, পি সি নাইক ও এল শতপথী

পাঠানি সামন্ত: দ্য গ্রেট হিন্দু অ্যাস্ট্রোলজার, প্রভুকল্যাণ মহাপাত্র, ওড়িশা রিভিউ, ডিসেম্বর ২০০৭

পঞ্জিকা সংস্কার: ক্ষেত্রমোহন বসু

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে নিয়ে কয়েকটি লেখা

(সমাপ্ত)

গণিতের সঙ্গে চলাফেরা

ভূপতি চক্রবর্তী

পাঠ্য বিষয় হিসেবে গণিত এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে একথা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রায় সকলেই জানি। গণিত অন্য বিষয় থেকে একেবারেই আলাদা। তার ভাষা ও যুক্তির গঠন ভিন্নতর। বিজ্ঞানের বিষয়গুলিও গণিতের থেকে আলাদা। যদিও তাদের অধিকাংশের পঠনপাঠনে গণিতের সাহায্য অতি আবশ্যিক। আর তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন তো রয়েইছে। অক্ষরজ্ঞানের মতোই জরুরি গণিতের কিছু প্রাথমিক শিক্ষা।

মানুষ কিন্তু ঐ প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াও এমন কতগুলি কাজ করে, যা তার ভেতরকার এক নিহিত গণিত জ্ঞানের পরিচয় দেয়। আয়তাকার মাঠ অতিক্রম করার সময় মানুষ তার কর্ণ বরাবর, মানে আড়াআড়ি চলে, যদিও সে হয়ত জানে না যে ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর। রেলের ওভারব্রিজ ব্যবহার না করে সরাসরি লাইনটা পেরিয়ে গেলে পরিশ্রম ও পথ দুই-ই বাঁচে সেটাও সকলে জানেন। অনেকেই একে হয়ত অভ্যাস বলবেন কিংবা অজস্র মানুষকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করার প্রক্রিয়া বলবেন, তবু মনে হয় একটা বোধ কোথাও কাজ করে। সাধারণ রাস্তায় ছুটে-চলা গাড়িকে যতটা দূরে দেখলে একজন নিশ্চিন্তে রাস্তা পার হয়ে যান, সেই মানুষটিই হাইওয়ে পার হওয়ার সময় একই দূরত্বে থাকা গাড়ি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। কারণ তিনি জানেন, হাইওয়েতে ছুটে চলা গাড়ির গতিবেগ অনেকটাই বেশি এবং এখানে রাস্তাটাও তুলনায় অনেক চওড়া। তাই রাস্তা পার হওয়াটা অনেক ঝুঁকির হয়ে যাবে।

রোজকার কিছু খুব চেনা ঘটনাও কিন্তু লক্ষণীয়। বাজারে নানা কেনাকাটা করতে গিয়ে দেখা যায়, কিছু যথেষ্ট কমবয়সী কিশোর বিক্রেতা অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে ৩৫০ গ্রাম পটল কিংবা ৪৫০ গ্রাম কুমড়োর দাম হিসেব করে ফেলে। প্রথমটির কেজি হয়ত ২৮ টাকা, দ্বিতীয়টির ১৮ টাকা। খুচরো সমস্যার মোকাবিলায় ক্রেতাকে সামান্য বেশি জিনিস নেওয়ার অনুরোধ করে চমৎকারভাবে দামকে পৌঁছে দেয় এমন জায়গায়, যেখানে খুচরো ছাড়াও দিব্যি লেনদেন চলে। এবং এখানেও সমস্তটাই চলে মুখে মুখে।

গণিতকে আমি পছন্দ করি বা ভয় পাই, তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলার উপায় নেই। গণিতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ না থাকলে হয়ত বা বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো ছাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয় বা ঐ রাস্তায় হাঁটতে চায় না। কিন্তু রোজকার কাজে গণিতের প্রয়োজনীয়তা সকলকেই মানতে হবে। আদতে গণিতের চলন একান্তই তার নিজস্ব, তার যুক্তির কাঠামো খুবই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। আর সেখানেই কখনওসখনও আমাদের অসুবিধে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দু-একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। কেন আমাদের দৈনন্দিন যুক্তির কাঠামো গাণিতিক যুক্তির কাছে ধাক্কা খায়।

একটা খুব পরিচিত অঙ্ক এরকম। দুটি সংখ্যার যোগফল ৮০ এবং বিয়োগফল ৩০। সংখ্যা দুটি কত? খুব সহজেই দেখানো যাবে যে সংখ্যা দুটি ৫৫ এবং ২৫। বীজগণিতের সাহায্য লাগবে ঠিকই কিন্তু হয়ত বা একটু চিন্তা করে অনেকে কাগজ কলম ছাড়াই হিসেব করতে পারবেন। এবার ঐ প্রশ্নটির ভাষা একটু পরিবর্তন করে বলা হল যে দুই ব্যক্তির বয়সের সমষ্টি ৮০ বছর এবং তাদের বয়সের পার্থক্য ৩০ বছর। উত্তর হবে একইভাবে, তবে বলতে হবে একজনের বয়স ৫৫ বছর আর অন্যজনের ২৫ বছর। অর্থাৎ একক হিসেবে বছর কথাটা যেহেতু প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে উত্তরে সেই এককের উপস্থিতি অবশ্যই থাকবে। ধরা যাক ঐ প্রশ্নের ভাষা আরেকটু পরিবর্তন করে বলা হল যে, দুই দাস ও মিঃ পালের বয়সের সমষ্টি ৮০ বছর ইত্যাদি। এবার কিন্তু উত্তরটা একটু অন্যরকম হবে, কারণ মিঃ দাসের বয়স ৫৫ বছর এবং মিঃ পালের

২৫ বছর। এই উত্তরটা যেমন ঠিক তেমনই এর উল্টোটা অর্থাৎ মিঃ পালের বয়স ৫৫ এবং মিঃ দাসের ২৫ এই উত্তরটাও সমানভাবে ঠিক। তাই প্রশ্নটি এভাবে রাখা হলে দুটো বিকল্পই গ্রহণযোগ্য। বস্তুত দুটো উত্তর না লিখলে উত্তরটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এবার প্রশ্নটায় আরো একটু পরিবর্তন আনা যাক। বলা হত যে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৮০ বছর ও তাদের বয়সের অন্তরফল ৩০ বছর। উভয়ের বয়স নির্ণয় করো। এবার কিন্তু উত্তর আবার একটাই; পিতার বয়স ৫৫ বছর আর পুত্রের ২৫ বছর। না, অন্য উত্তরটা (বাবা ২৫ বছর আর ছেলে ৫৫ বছর) চলবে না। কারণটা অবশ্যই গাণিতিক নয়, আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কেউ যদি ঐ 'অসম্ভব' উত্তরটা লেখে, তাকে কি শূন্য দেওয়া হবে? আদতে কোনো ছাত্র কেবল ঐ দ্বিতীয় বিকল্পটি লিখলে শিক্ষক ছাত্রের গাণিতিক দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না, সম্ভবত তার বোধের অভাব লক্ষ্য করে শূন্য দেবেন। আর এরকম একটা অঙ্কে যদি কোনো বয়স ঋণাত্মক বার হয় তবে তা একেবারেই চলবে না।

এরকম বিষয় অবশ্য আরও আছে। অর্থাৎ গাণিতিকভাবে সঠিক হলেও বাস্তবে তা গ্রহণযোগ্য হয় না, আমাদের ভুরু কুঁচকে ওঠে। ধরা যাক, কোনো অঙ্কে বলা হল যে কলকাতা থেকে একটি ট্রেন সকাল আটটায় যাত্রা শুরু করে বেলা তিনটেয় নয়াদিল্লি পৌঁছল, তারপর ...। এটুকু শুনেই কিন্তু ছাত্রের প্রশ্নটা মনঃপুত হবে না। কারণ কলকাতা থেকে নয়াদিল্লির দূরত্ব প্রায় ১৪৫০ কিমি, মাত্র সাত ঘণ্টায় কোনো ট্রেন ঐ দূরত্ব অতিক্রম করলে ট্রেনের গড় গতিবেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় ২০০ কিমি-র বেশি। আমাদের দেশে ঐ গতিবেগে এখনও কোনো ট্রেনই চলে না। তাই ছাত্র হয়ত ধরে নেবে যে ঐ দূরত্ব ট্রেনটি অতিক্রম করেছে ২৪ যোগ ৭ অর্থাৎ ৩১ ঘণ্টা সময়ে অর্থাৎ যেদিন সকাল আটটায় ট্রেনটি যাত্রা করেছিল নয়াদিল্লি পৌঁছেছে সেদিন বিকেলে তিনটেয় নয়, তার পরদিন বিকেল তিনটেয়। ৩১ ঘণ্টায় ঐ ১৪৫০ কিমি অতিক্রম করা হয়েছে শুনলে আমাদের বেশ স্বস্তি হয়, ব্যাপারটা বেশ চেনা লাগে।

কিন্তু যদি আমরা ঐ ট্রেনের প্রশ্নে তার যাত্রা শুরুর শহরটা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস করে দিই আর গন্তব্যস্থল হিসেবে প্যারিস থেকে ১৪৫০ কিমি দূরে অবস্থিত ইওরোপের কোনো শহরের নাম দিই, তাহলে ব্যাপারটা দিব্যি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ইউরোপে ঘণ্টায় ২০০ কিমি-তে চলা ট্রেনের অভাব নেই। গণিত এখানে নিরপেক্ষ। আমাদের যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান রয়েছে আদতে হোঁচট খাই তার কারণেই। কিছু দেশে অঙ্কের বয়ান কোনো জায়গাতেই মেলানো যায় না। যেমন ধরা যাক, কোনো অঙ্কের শুরুটা হল এইভাবে, একটি ছেলে সেকেন্ডে ১২ মিটার বেগে ছুটছে। আর একটি ছেলে তার থেকে ২০০ মিটার পেছনে থেকে সেকেন্ডে ১৪ মিটার বেগে প্রথম ছেলেটিকে ধাওয়া করল। কতক্ষণ বাদে দ্বিতীয় ছেলেটি প্রথমটিকে ধরে ফেলবে? নিরীহ অঙ্ক। কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, এখন পর্যন্ত কোনো মানুষ ওইরকম বেগে ছুটতে পারে নি। একশো মিটারের দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারীকে বলা হয় পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ। ঐ একশ মিটার অতিক্রমের জন্য তিনি সময় নেন ৯ সেকেন্ডের কিছু বেশি। অতএব তাঁর গড় গতিবেগ সেকেন্ডে ১০ মিটারের কিছু বেশি, তবে তা সেকেন্ডে ১২ মিটার নয়, ১৪ মিটার তো নয়ই।

তাহলে কি অঙ্কটা ভুল। না, তা বলা উচিত হবে না। তবে অঙ্কের প্রশ্নে বাস্তবতার সঙ্গে যোগ থাকলে অঙ্ক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আবার কখনও অঙ্ক আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবসম্মত হলেও একটু খতিয়ে ভাবলে অন্যরকম কিছু ধরা পড়ে। যেমন ঐকিক নিয়মের অঙ্কের ক্ষেত্রে বলা হল যে ১৮ জন লোক দৈনিক ৭ ঘণ্টা কাজ করে ১২ দিনে কাজ শেষ করে। কতজন লোক দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করে ৯ দিনে কাজটি শেষ করবে। যেহেতু এখানে কিছু শ্রমিক শ্রম দিয়ে কাজটি তুলছে মোট শ্রম দিবস বা মোট দৈনিক কাজের সময় দিনসংখ্যা এবং শ্রমিক সংখ্যার গুণফল ঐ সামগ্রিক কাজের জন্য সমান হতে হবে। তাই যখন দেখা যাচ্ছে দৈনিক কাজের সময় বেড়ে ৭-৮ ঘণ্টা হচ্ছে তখন শ্রমিকের প্রয়োজন হবে কম কিন্তু একই কাজকে কম দিনে শেষ করতে বলায় শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এইসব মাথায় রেখে হিসেব করলে উত্তরটা দাঁড়াবে ২১, অর্থাৎ ২১ জন শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করে ৯ দিনে ঐ কাজটি তুলতে পারবে।

এবার ধরা যাক, আমি শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় একই রেখে অর্থাৎ তাঁরা ৮ ঘণ্টা দৈনিক কাজ করবেন এরকম একটা বাস্তবসম্মত শর্ত রেখে শ্রমিক সংখ্যা বাড়াতে শুরু করলাম। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে কাজটা তুলবার

জন্য প্রয়োজনীয় দিন সংখ্যা কমতে থাকবে। বস্তুত আমি যদি ১৮৯ (২১X ৯) জন শ্রমিককে ঐ কাজে লাগাতে পারি তাহলে একদিনেই কাজ শেষ। শ্রমিকসংখ্যা দ্বিগুণ করলে কাজ শেষ একবেলাতেই– মাত্র চার ঘণ্টায়! ঠিক এখানেই একটু থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে হবে যে, কাজটা কি এভাবে করা যাবে? সত্যিই কি সেখানে প্রায় দুশো শ্রমিক একই সঙ্গে কাজে লেগে পড়তে পারবেন? যদি কাজটা হয় একটা ছোট দোকানঘর তৈরি তাহলে নিশ্চয়ই বলা যায় কাজটা একবেলা কেন এক দিন বা দু দিনেও হবে না। সেখানে প্রথমে ভিত কাটা হবে, ইট সিমেন্ট বালির গাঁথনি উঠবে। তাকে কয়েকদিন শুকোতে দিতে হবে তারপরে কাজ এগোবে ধাপে ধাপে। তবে আবারও বলব গণিত কিন্তু ঠিকই বলেছে। তবু অঙ্ক কষে যদি কোনো মানুষের বয়স বার হয় ১৭০ বছর কিংবা একটি হাতির ওজন ১০ কেজি, মনটা ঠিক তা মেনে নেয় না। দেখতে হয় ভুল হল কি না।

শেষ করব বহুদিন আগের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলে। তখন অঙ্ক কেবল অঙ্ক ছিল না— ছিল চমৎকার ভাষাশিক্ষার জায়গা। বলবিদ্যা বা মেকানিকস ক্লাসে শিক্ষকমশাই একটি অঙ্ক ছাত্রদের দিচ্ছেন। অঙ্কটির ভাষা চলিত বাংলা নয়, সাধুভাষা। 'একটি তস্কর একটি তোরঙ্গ চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল। ১২০ ফুট দূর হইতে একজন প্রহরী তাহাকে দেখামাত্র তৎপশ্চাতে ধাবমান হইল। তস্করটি বিষয়টি বুঝিতে পারিয়া সেকেন্ডে ১০ ফুট সমবেগে দৌড়াইতে লাগিল। প্রহরীটি তাহার দৌড় শুরু করার ২৪ সেকেন্ড পরে তস্করটিকে ধরিতে সক্ষম হইল। যদি প্রহরীটি সমবেগে দৌড়াইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার বেগ নির্ণয় করো।'

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই একটি প্রশ্নের মধ্যে কতগুলি চমৎকার বাংলা শব্দ রয়েছে। তস্কর, তোরঙ্গ, প্রহরী, ধাবমান, তৎপশ্চাতে, সক্ষম এরকম অনেক শব্দ একটা অঙ্কের প্রশ্নের মধ্যে ঢুকে রয়েছে।

অঙ্কের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, তার একটা নিজস্ব গঠন রয়েছে এবং অঙ্কের প্রশ্ন সচরাচর সেই ভাষাতেই হয়ে থাকে। এর ফলে পুরো বিষয়টা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো হয় এবং মূল বিষয় থেকে দৃষ্টি হারিয়ে যায় না। তবু সেই অঙ্কের ভাষাকেও ক্ষেত্রবিশেষে আলঙ্কারিক করে তোলা যায়।

যুক্তির কাঠামো নিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয় জ্যামিতির ভাষা। উপপাদ্য তো বটেই, যে সমস্ত জ্যামিতির অনুশীলনী করতে দেওয়া হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কথায় সেগুলিকে তুলে ধরা হয়। আমরা এই ধরনের অনুশীলনীকে জ্যামিতির এক্সট্রা এবং রাইডার বলতে অভ্যস্ত। অঙ্কের ক্ষেত্রে তাই ভাষার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা ভাষায় গণিতের উপস্থাপনা অত্যন্ত ভালো যদিও দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের ছাত্রদের শব্দসম্ভার কমে যাওয়ায় তারা অনেক সময় অসুবিধায় পড়ছে।

ফিরে আসি অঙ্কটির কথায়। ঠিক অঙ্ক নয় সেই শিক্ষকমশাইদের কথায়। অঙ্কটির উত্তর নিয়ে আলোচনায় যাব না বরং উল্লেখ করব শিক্ষক মহাশয়ের মন্তব্যগুলি। তিনি ছাত্রদের বললেন, 'নিশ্চয়ই ধরে নিবি যে চোর এবং প্রহরী সরলরৈখিক রাস্তায় ছুটছে। ধরে নিবি, চোরকে পুলিশ অন্ধকারেও ঠিক দেখতে পাচ্ছে, আর ঠিক সেদিকেই তাক করে ছুটছে। আর অবশ্যই ধরে নিবি যে চোরটা খুবই সৎ, অঙ্কের স্বার্থে একেবারে সোজা রাস্তায় ছুটছে কোনো গলিঘুঁজিতে ঢুকে যাচ্ছে না। আর পুলিশ তো খুবই কর্তব্যপরায়ণ। একেবারে চোরের পিছু পিছু নিষ্ঠাভরে ছুটছে।'

এত কিছু বলার পরেও শিক্ষক মশাই একটু প্যাঁচ দিয়ে দিলেন প্রশ্নটায়। 'আচ্ছা বলত যদি ঐ তোরঙ্গটার ভর চোরের ভরের এক চতুর্থাংশ হয় তাহলে ওটা ফেলে দৌড়লে কি ও ধরা পড়ত? ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটা মনে আছে তো?'

বুঝতে পারছি একেবারে শেষটা নিছকই বিজ্ঞানের ছাত্রদের উপযোগী হয়ে গেল। আশা করব সুধী পাঠক নিজগুণে তা মার্জনা করবেন আর আমাদের নিত্যসঙ্গী গণিতের প্রতি তাদের আগ্রহ বজায় রাখবেন।

এবারেও আপনাদের
সঙ্গে দেখা হচ্ছে
আগামী বইমেলায়।

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 20.00
৩৪ বর্ষ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ ২০ টাকা মাত্র

প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	সংকলন	৪২.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক	রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু	হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন	সংকলন	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান	সংকলন	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	নিরঞ্জন ধর	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	সংকলন	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে	সংকলন	৩৫.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	সম্পাদিত	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	সংকলক: প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৪০.০০
মূল্যবোধ	সংকলন	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুন্ডু, ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বি বা দী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রিট), বইকল্প ১৮বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৩১, জ্ঞানের আলো (যাদবপুর কফি হাউসের উল্টোদিকে), থিমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, ডঃ গৌতম মিস্ত্রি, ইনস্ট্যান্ট ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস, মন্ত্রীবাড়ি রোড, পোঃ চৌমাথা, আগরতলা- ৭৯৯ ০০১। ফোন: (০৩৮১)২৩০৮২৪৪/২৩১২৯৩৭।

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ